# দুর্ঘটনার রহস্য

শ্রীকানাইলাল মুখোপাধ্যায়

এটাও তো ৩১ ম্বংরা !   একই নম্বর !   [ পৃঃ ৩১

# দুর্ঘটনার রহস্য

## এক

বাইরের প্রকৃতির রূপ দেখে চমক লাগল সাধনের। মানুষের ব্যথার সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। সাধনের দাদা, যিনি জীবনের সব শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে ওকে গড়ে তুলছিলেন, তার নিষ্ঠুর হত্যার পরেও চারিদিকে কোন দুঃখ চেপে বসেনি। সূর্যের আলোকে চারদিকে যেন খুসীর ঝলক লেগেছে।

ঝির্ ঝির্ ক'রে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। পরিচ্ছন্ন, অকৃপণ সূর্যালোকে ঘাসে, লতায়, গাঢ় সবুজ গাছের পাতায় এখনো-লেগে-থাকা জলের ফোঁটা মুক্তার মত জ্বলছে।

সাধন একবার নড়ে-চড়ে উঠল মোটা কম্বলের মধ্যে। মনে হ'ল খুব ভোরেই তার খবর নিবার কথা ছিল। কিন্তু মাথাটা যেন তুলতে কষ্ট হ'ল তার, অনুভব করল মাথাটা শুধু অসম্ভব ব্যথা করছে না, এই পাহাড়ের মতই যেন ভারি হয়ে আছে। পাশ ফিরে শুল সে। কম্বলটাকে গায়ে টেনে দিল আরো ভাল ক'রে।

রোদে ভ'রে গেল পৃথিবী। পাহাড় পাথর কেটে বহুকালের বহু মানুষের চেষ্টায় যে পথ তৈরী হয়েছে, সেটি ভরে গেল

মানুষের যাতায়াতে। সাধনের অবসর সময় (যদিও এখন তা' ছিল খুবই কম) এই পথটির উপর চোখ পেতে রেখে কেটে যেত। শুধু কেটে যেত তাই নয়—কেমন ক'রে কাটত, তা' সে বুঝতে পারত না। ক্ষুধার তাগিদে মানুষের অভিযান কতই না বিচিত্র ভাবে প্রকাশ পায় ঐ পথের উপর। নারী পুরুষ, ছেলে বুড়ো নানা রকমের পোষাক প'রে, নানা রকমের পণ্য নিয়ে কেউ বোঝার ভারে নুয়ে হাঁটে; কেউ গাড়িতে বোঝাই ক'রে গোরুগুলিকে তাড়িয়ে নেয়, কেউ বা খচ্চরের পিঠে মাল চাপিয়ে নিয়ে যায় বাজারে। এই স্বাস্থ্যকর দেশে স্থানীয় অধিবাসীদের স্বাস্থ্য কতই না খারাপ! ওদের জীবনের অভ্যাসগুলিও অতিশয় নোংরা। সাধন কার কাছ থেকে শুনেছে যে এদের মধ্যে অনেকেই ক্ষয়রোগে ভুগছে।···

কতক্ষণ এ-রকম আধো তন্দ্রা, আধো জাগ্রত অবস্থায় কেটেছিল বলতে পারে না। হঠাৎ মনে হ'ল কেউ যেন আসছে এদিকে—তার চলবার শব্দ এলো ওর কানে। পদশব্দটা ওর ঘরের সম্মুখে এসে থামল। দরজায় টোকা দিতে দিতে ডাকল সতীশ।

দরজা খুলে দিতেই সরাসরি ঢুকল এসে সে। সুন্দর, বলিষ্ঠ চেহারা সতীশের। কয়েকদিন দাড়ি-গোঁফ কামায়নি—তবু ওর পরিশ্রান্ত মুখে রক্তোচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। কপালের ঘাম বাঁ হাত দিয়ে মুছে প্রশ্ন করল সতীশ—বেরোও নি সকালে?

—শরীরটা খারাপ লাগছিল, তায় জল হ'ল···

—অজুহাত শুনে আমার কোন লাভ নেই সাধন! কাজটা সেরে রেখেছ কিনা তাই শুধু জানতে চাই আমি। শরীর খারাপ হয়ে থাকে যদি তবে বলো চিকিৎসার ব্যবস্থা করি।

সাধন একটু আহত হ'ল সতীশের কথায়। কিন্তু তা নিয়ে কিছু বলতে সাহস পেল না। বন্ধু হ'লেও সতীশ তার আসন সহজেই আলাদা ক'রে রেখেছে। সাহায্য চাওয়া যায় সেখানে, বিপদে প'ড়ে ছুটে যাওয়া চলে। কিন্তু সমান-সমানের দাবীর কথা সাধন কেন, সতীশের কোন বন্ধুই তার কাছে বলতে পারে না। তা ছাড়া বর্ত্তমান ব্যাপারে সতীশের তো কোন স্বার্থই নেই. সাধনের বিপদকেই সে মাথায় ক'রে এই বিশ্রী এবং বিপদপূর্ণ স্থানে শহরের আনন্দ-উৎসব-আরাম ছেড়ে চ'লে এসেছে। সাধন বেশ কিছুটা সময় নির্ব্বাক থাকছিল, তাগিদ দিল সতীশ—চুপ করলে যে?

—ভাবছিলাম সতীশ, শরীরটা একটু খারাপ হ'লেও খবরটা নেওয়া উচিত ছিল আমার!

—হ্যাঁ। কিন্তু শরীরটা কি সত্যি খারাপ হয়েছে তোমার?

এবারে সাধন আর নিজেকে চাপতে পারল না।—গরজ তো তোমার চেয়ে আমার কম নয় সতীশ! আমি দোষ স্বীকার ক'রে নেওয়ার পরেও কেন খোঁচা দিচ্ছ আমাকে?

সতীশ বলল, দোষ স্বীকার করবার মধ্যে মনের উদারতা তোমার আছে মানি। কিন্তু এমন কতকগুলি ব্যাপার আছে যাতে দোষ করলে তা' ভয়ানক ক্ষতির কারণ হয় এবং পরে দোষ মেনে নিলেও সে ক্ষতি পূরণ হয় না। গরজ তোমার হ'তে পারে, কিন্তু কাযে যদি তা' দেখা না যায়, তবে মুখে গরজ জানানোর তো কোন মানে হয় না!

—যা হয়েছে তা' আর ফিরাতে পারবে না। এখন আমায় কি করতে হবে বলো?

—কায করতে হবে! আজ যোগ দিতে পারবে?

—পারবো। কিন্তু কি কায?—নিশ্বাস আটকে এলো যেন সাধনের।

—কুলীর কায?

—পারবো কি?

—তোমার মনের উপর নির্ভর করে সাধন!

—আর তুমি?

—আমি এখনো কোন কাযে জড়িয়ে পড়তে চাইনে। আরো কয়েকদিন আমাকে ঘুরে বেড়াতে হ'বে খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য। ঠিক জায়গাটি না জানলে কাযে লেগেও হাতড়ে বেড়ানই সার হবে। কি ভাবে এবং কার কার চক্রান্তে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল, তা' কোন রকম আন্দাজ ক'রে না নিলে খুব বেশী সময় লাগবে।

—খাতের কুলী হয়েই বা কি লাভ তা'হলে?

—লাভ আছে বই কি! বাসু খবর দিয়েছে ধানবাদ থেকে। যেখানে বিস্ফোরণ হয়েছিল, সেটা আবার খুলবার অনুমতি পেয়েছে এরা এবং তা'র কায দু'একদিনের মধ্যেই নূতন করে আরম্ভ হবে।

—ঠিক খবর তো?

—পাক্কা।

এবারে সাধনের চোখটা দপ্ ক'রে জ্বলে উঠল। শুধু বলল সে—আমি রাজী সতীশ! খাতে কায করাবো।

সতীশ গম্ভীরভাবে বলে গেল, কুলী সংগ্রহ যারা ক'রে তাদের সঙ্গে দেখা ক'রে ব্যবস্থা করতে হবে তোমার। ভদ্র-লোকের ছেলে ব'লে সন্দেহ করলে বিপদ হবে।

—কাযে ভর্তি করবে না, এই তো?

—সে তো আছেই এবং তা'তে আমাদের বিশেষভাবে পিছিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু সব চেয়ে বড় ক্ষতি হবে এই যে, আরো একটা বাড়তি দুশ্চিন্তার মাঝে গিয়ে পড়তে হবে। বাডুয্যে এটা বুঝতে পারছে যে অতবড় একটা ব্যাপার এত সহজে মিটতে পারে না। আর পারলেও সে সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হ'বার সময় এখনো আসেনি। একেবারে নীরব এবং সাবধানী লোকের মত সাংঘাতিক শত্রু আর নেই। তোমার উপর সন্দেহ যেতেই বাডুয্যে গোপনে খোঁজ-খবর নিতে থাকবে। যদি তোমার পরিচয়না-ও জানতে পারে, তবু তোমার উপর এমন নজর রাখবে যে, তোমাকে দিয়ে কোন কাযই পাব না;

আর বাধ্য হয়েই আমার নিজকে বাঁচানোর জন্য তোমার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্কই কেটে ফেলতে হবে।

সাধন শিউরে উঠল। যেন এই অবস্থায় সতীশের বন্ধুত্ব ও সান্নিধ্য না পেলে তার কোন উপায়ই আর থাকবে না।

তবু সে জিজ্ঞাসা করল—আর যদি জানতে পারে আমি মালিকের ভাই ?

—হয়ত আরো একটা ছোট বিস্ফোরণ হবে খনির ভিতর। মরবে তুমি আর সঙ্গে দু'একটি কুলী।

—বিস্ফোরণ কি এতই সোজা যে ইচ্ছেমত হাতে গড়া চলে ?

—সে-রকম সন্দেহই হচ্ছে আমার। খাতে নেমে তুমি ভিতরের একটা যথাযথ বিবরণ ফটোগ্রাফের মত আমাকে দিতে চেষ্টা করবে। সেটা পেলে আমি বুঝতে পারবো যে আমার সন্দেহ ঠিক কিনা।

—তুমি বলো কি সতীশ ? খনির ভিতর নানারকম গ্যাস জন্মায় এবং তার দু'একটাই নানান্ যোগাযোগে এ-রকম দুর্ঘটনার কারণ হয়। ইচ্ছে ক'রে বন্দোবস্ত ক'রে রীতিমত অঙ্ক কষে তা করা যায় নাকি আবার ?

—পৃথিবীতে অসম্ভব কিছু নেই। তোমার দাদার মৃতদেহ পরীক্ষা করে ডাক্তার কি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তদন্ত কমিটির কাছে, তা' ভেবে দেখলেই তুমি ব্যাপারটা ঠিক সাধারণ বিস্ফোরণ বলে ভাবতে পারবে না। দাদাকে আমিও কম জানতাম না।

যেমন বাইরে থেকে নিজে অনেক জ্ঞান আহরণ ক'রে এসেছিলেন, তেমন প্রতিটি কাযের মধ্যেও তার প্রয়োগ করতে চাইতেন তিনি। কয়লা খনির ডাক্তাররা সাধারণতঃ যে রকম হয়ে থাকেন, ডাঃ সিংহ তা' নন। তিনি শুধু একজন খুব ভাল চিকিৎসকই নন, বিশেষজ্ঞও বটেন—খনির দুর্ঘটনা ইত্যাদির ব্যাপারে। এ-জন্যই হয়ত দাদা তা'কে অত বেশী মাইনে দিয়ে সরকারী চাকুরী থেকে টেনে এনেছিলেন। সকল ব্যাপারেই সব চেয়ে সক্ষম ও গুণী লোক নিয়োগের ফলেই মাত্র পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে এই কোলিয়ারি আর সবগুলিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

—সে তো তোমার এই খাতের কয়লা অন্যান্য খনির থেকে ভাল বলে!

—অংশতঃ। আসলে খাত চিনে নেবার জন্যও তো চাই ভাল ও বিচক্ষণ লোক। অতবড় সন্দেহ করছি ম্যানেজার বাড়ুয্যেকে, তবু একথা ভুললে চলবে না যে, ওর মত রাসায়নিক এবং কয়লা সম্বন্ধে জ্ঞানী লোক এদেশে খুব কমই আছে আর! কিন্তু যে কথা বলছিলাম...ডাঃ সিংহ তো কোন বিষাক্ত গ্যাসের কথাই জোর ক'রে বলতে পারেন নি! চেষ্টা অবশ্য খুবই হয়েছিল কোন একটা গ্যাস্‌ট্যাসের বিষয় সপ্রমাণ করবার এবং সাধারণ বা দাম্ভিক লোক হ'লে ডাঃ সিংহ খুব বড় বড় কয়েকটা গ্যাসের থিওরি বলে নাম করতে চাইতেন। তার দ্বিধা, তার অনিশ্চয়তা কমিটির সামনে তা'কে কোন সম্মান বা প্রশংসাই

দেয়নি। কিন্তু সত্যিকার বিজ্ঞানীর মতই তিনি শক্ত থেকেছেন এই বলে যে, যে-বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত নন তা' কোনমতেই জোর ক'রে বলতে পারবেন না।

—ডাঃ সিংহের জবানবন্দী শুনেই কি তুমি দাদার মৃত্যু সম্বন্ধে একটা সন্দেহ করলে প্রথমে ?

—না। আকস্মিক দুর্ঘটনা, হঠাৎ কোন অজ্ঞাত বাষ্প ফেটে গিয়ে শোচনীয় মৃত্যু—এ জাতীয় একটা সিদ্ধান্তে আসবার জন্য কমিটিকে এত ক'রে বুঝানোর ব্যাপারেই প্রথম আমার সন্দেহ হ'ল। দাদা মরেছেন, তা'তে আমরা খুব দুঃখিত হ'ব —সে তো স্বাভাবিক। কিন্তু যে-মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়, যে মৃত্যু আকস্মিক, তার প্রমাণের জন্য কারুরই এত ব্যস্ততা, এত দুর্ভাবনা হ'তে পারে না তো !

—কিন্তু ম্যানেজারকে সন্দেহ করবার কি হ'ল ?

—যখন দেখলাম যে, হিসাবে খনির ভয়ানক লোকসান দেখা যাচ্ছে এবছর। ফলে, দাদার অংশ বিক্রী ক'রে দেওয়ার জোরালো যুক্তি এলো তার তরফ থেকে। ম্যানেজারের জন্য দাদা অনেক কিছু করেছিলেন। তার শোচনীয় মৃত্যুর পরে ওর পক্ষে উচিত ছিল খনিকে লাভে আনবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা এবং দাদার স্বার্থ দেখবার জন্য তোমাকে বা আর কোন আত্মীয়কে ডাকা।

—ম্যানেজার নিজে তো আর দাদার অংশ কিনতে চাননি ?

—কিন্তু খবর নিলেই জানতে পারতে যে সাত্যকি সেন আর কেউ নয়, ম্যানেজারের সহকারীর দূর সম্পর্কের এক ভাই, অর্থাৎ যার নামে কিনে নিয়ে কিছুদিন পরে আবার নিজের নামে খরিদ করা চলবে। তা' ছাড়া সাত্যকি সেনের সাত পুরুষ কোনদিন কয়লার ব্যবসা করেনি। শুধু তাই নয়—সাত্যকি নিতান্ত গরীব মানুষ ; নিরীহ শিক্ষাজীবী—শ'খানেক টাকামাত্র কামাই করে এক মফস্বল কলেজে। ম্যানেজার যদি এজাতীয় প্রস্তাব কোন চিঠিপত্র লিখে করত··

—তা'হলে কি হ'ত সতীশ ?

—খুব ভাল একটা প্রমাণ হয়ে দাঁড়াত এটা। কিন্তু বলেছে মুখে এবং কথাটা তাই সত্যি হলেও শেষ অবধি কোন কাযে লাগানো যাবে কিনা বুঝতে পারছি নে।

—সাত্যকি সেন সম্বন্ধে খবর দিলে কে এত ?

—বাসু-ই যোগাড় করেছে। কিন্তু গল্প করা তো আর চলছে না সাধন ! এবারে যে তোমাকে উঠতেই হবে ! কাল থেকে কাযে লাগতে হলে, আজ বিকেলের মধ্যে তোমাকে ভর্তি হতে হ'বে।

সতীশ উঠে পড়ল।

কিন্তু দেখা গেল যে অদ্ভুত একটা পরিবর্ত্তন এসেছে সাধনের উপর। এতদিন সে বলতো যে ম্যানেজারের উপর সন্দেহটা অমূলক বা মিথ্যাও তো হতে পারে ! দাদার মৃত্যু তার যতই দুঃখের বা ক্ষতির কারণ হয়ে থাক্, তবু তা' নিয়ে মিথ্যা সন্দেহের

বশে একটা নিরপরাধ লোকের ক্ষতি করবার চেষ্টা করতে তার মন কিছুতেই সাড়া দিয়ে উঠছিল না।

সতীশের কথা আলাদা। সাতকুলে কেউ নাই ওর—মনভরা রয়েছে কেবল সন্দেহ, মাথায় তুখোর বুদ্ধি আর দেহে অসুরের মত না হলেও অসাধারণ শক্তি। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো, সব ব্যাপার খুঁচিয়ে ভিতরের তথ্য জানা, কোন কিছুকেই একবারে উড়িয়ে না দেওয়াই ওর স্বভাব। টাকা-পয়সার চিন্তাও তেমন একটা নেই। তা' ছাড়া দু'একটা ডাকাতি আর খুনের তদন্ত ক'রে ওর হাত খুলে গিয়েছিল; নইলে নিজ মতানুসারে স্বাধীনভাবে কায করবার সুযোগ পাওয়া যায় না ব'লে হয়ত সরকারী (পুলিস বিভাগের) চাকুরীটা অমন ক'রে ছেড়ে দিতে পারতো না।

কিন্তু কাযে নামার সঙ্গে সঙ্গে যার আর সব তুচ্ছ হয়ে যায়, শয়নে-জাগরণে শুধু কাযের কথাই দেহে-মনে সুড়সুড়ি দিয়ে বেড়াতে থাকে, তাদের সঙ্গে তাল রেখে চলবার কি বিপদ তা' সাধন টের পাচ্ছিল হাড়ে-হাড়ে। এত কষ্ট, এত দুর্দ্দশা দেহটা যেন আর সইতে পারছিল না। আর সব চেয়ে খারাপ হ'ল এটাই যে, এত কেন সইছি, এত কষ্ট কেন করছি—তার কারণ আমি জানি না, জানে অপরে। শুধু কারণটাই যে অজ্ঞাত তা' নয়—যা' করছি তার অনেকখানিই যদি মনে হয় পাগলামো বা অর্থহীন, তখন মেজাজও ঠিক রাখা অসম্ভব হয়ে ওঠে না কি? অনাহারে অনিদ্রায়, জলে রোদে ভিজে পুড়ে একটা টিলার

আড়ালে কন্‌কনে ঠাণ্ডায় নড়বড়ে কাঠের ঘরে কয়েকদিন থেকে সাধনের দেহ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল; মনও হয়ে উঠেছিল বিরূপ। তা' নইলে অমন সৃষ্টিছাড়া আলসেমিতে তাকে পেয়ে বসত না।

অথচ মেঘ কেটে রোদ উঠবার মতই অনেকখানি সেরে উঠল সাধন সতীশের সঙ্গে এই আধ ঘণ্টার আলাপে। তার মনে হ'ল যে ম্যানেজার বাস্তবিকই দোষী এবং এ-পর্যন্ত সতীশের আদেশ-নির্দেশে সে যা করেছে তার সবই ব্যর্থ হয়নি, তার অনেকখানির ভিতরেই ছিল গভীর অর্থ; সতীশের সার্থক অনুমান ও পরিকল্পনা।

চক্‌চকে চোখে তাকিয়ে সাধন বলল আমি এক্ষুণি বেরুচ্ছি, সতীশ! কুলী সর্দারটাকে ভেল্‌কি লাগাতেই হবে আমায়।

খুব লক্ষ্য ক'রে সতীশ বলল—চুলগুলি আরো একটু টেনে দাও কপালের সামনে। কথাটা ভাঙ্গা হিন্দীতে চালাবে। কিন্তু···নাঃ, ঠিক চ'লে যাবে!

—কি? কিছু একটা বলছিলে যেন?

—হ্যাঁ। গায়ের রংটা তোমার ততটা ফর্সা নয় দাদার মত। তবে হাতের আঙ্গুলগুলি অত সৌখীন থাকা কি মানানসই হচ্ছে?

যেন ধরা প'ড়ে গিয়েছে, এমনই একটা আতঙ্কের ছাপ মেরে দিল সতীশের কথাটা সাধনের মুখে। খাকী জামার পকেটে

হাত দুইটা পুরে দিয়ে সে চোখ বড় ক'রে বলল—উপায় কি হবে তা'হলে ?

—কয়লার গুড়ো, ছাই—এসব মাখিয়ে নিও ভাল ক'রে হাতের মধ্যে। জামাটায় তো নিজ থেকেই লেগেছে দেখছি। হাফ্ প্যাণ্টটা...ঠিকই আছে। শুধু আঙ্গুলগুলির দিকে লক্ষ্য রেখো। ভদ্রলোকের পরিচয় ওতেই সব চেয়ে বেশী লেখা থাকে।

---

# দুই

দু'দিন বাদে আবার এলো সতীশ। এবারে একা নয়; তার সঙ্গে এলো বাসু।

সাধন বাসুকে দেখে যেন উচ্ছল হয়ে উঠল, তা'কে অভ্যর্থনা করল সকলরবে।

সতীশ একটু হেসে বলল---ছেলেমানুষ! হাত কেটে যায়নি তো শাবল মারতে মারতে?

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গেই সাধন নেমে এল কঠোর, অন্ধকাব বাস্তবে। সেই সাজানো গুছানো শহরের বাড়িতে বিদ্যুতালোকিত সন্ধ্যা নয় এটা; তার সহপাঠী বাসু আজ তা'কে কোন চায়ের মজলিশে বা গানের জলসায় নিমন্ত্রণ করতে আসেনি।

বাসু মন্তব্য করল, কী রে অত নিভে গেলি কেন? খাটুনিটা বড় বেশী ঠেকছে, না?

সাধন ম্লান হেসে বলল—শাবল মারতে হ'লে কুলিয়ে উঠতে পারতাম না নিশ্চয়। সামান্য লেখাপড়া জানি, দাগ্‌রা দাগ্‌রা অক্ষরে হিসাব রাখতে পারি দেখে সর্দার মহাখুসী হয়ে গেল। তা' ছাড়া তাড়ির ঝোঁকে ওর খুসীর মাত্রা একবারে লোপ পেয়ে যেতে দেরী হ'ল না।

—সে তো পরশু বিকেলের কথা। পরের সকালে চিনতে পারল তো ?

—তা পারল। আমাকে কায দিয়েছে কয়লার গাড়ি ঠিক মত চলাচল করছে কিনা দেখতে, আর কত গাড়ি সারাদিনে উঠছে তা'র হিসাব রাখতে। যেখানটায় গ্যাস্ জ্বলে উঠেছিল সেখানটা হয়ে রয়েছে অসমতল। ঠেলাধাক্কা ক'রে গাড়ি-গুলিকে চালু করতে হয়—দৈহিক শ্রম এটুকুই।

—ম্যানেজারের কাছে যেতে হয়নি ?

—না। শুনলাম বাড়ুয্যে নাকি বিশেষ ব্যস্ত আছেন কী একটা কমিটির সভ্য হওয়ার ব্যাপারে।

বাসুদেব বলল—সে আমিও শুনে এসেছি। কয়লাখাতের অবস্থা-ব্যবস্থা কি ক'রে আরো অনেকখানি নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর করা যায়, তা' দেখবার জন্য সরকার থেকে নামকরা লোকদের নিয়ে একটা বড় বৈঠকের আয়োজন হচ্ছে। এর সদস্য হওয়ার জন্য বাড়ুয্যে খুব উৎসুক এবং ভিতরে ভিতরে খুবই চেষ্টাও করছে। তুমি শুনলে কা'র কাছে ?

—স্বাস্থ্য দেখবার জন্য নূতন কুলীদের সঙ্গে ডাঃ সিংহের কাছে আমাকেও যেতে হয়েছিল। ভয়ে মরি, খনির কাযের অনুপযুক্ত বলে বুঝি বা বাতিল করে দেয়। যে রকম কড়া লোক বলে নামডাক তার···আর দেখলাম তো নিজেই চার পাঁচজন বাতিল হয়ে গেল। সর্দার গজ্ গজ্ করছিল খুব যে এমন ডাগ্দার নিয়ে খনির কায সে চালাতে পারবে না।

—সেখানে কি ক'রে কথাটা উঠল? সতীশের সন্দেহ মাথা তুলল।

—পাস্ হয়ে গিয়ে মজুরী নিয়ে তর্ক বাঁধলো সর্দারের সঙ্গে। সে আমাদের নিয়ে যেতে চায় কেরাণীর কাছে; আমি বললাম, যেতে হয় তো যাবো একবারে ম্যানেজারের কাছে; কেরাণী ইচ্ছে থাকলেও আর বেশী মঞ্জুর করতে পারবে না। কাজেই সে দেখাবে মাইনে কম করবার সব যুক্তি; বা'র করবে যত অনুকূল নজীর।

—কী সর্বনাশ, ম্যানেজার তো চিনে ফেলত তোমাকে? ভাইয়ের সাদৃশ্য ছাড়াও কলকাতার বাড়িতে তো বাড়ুয্যে দেখেছে তোমায়!

—ম্যানেজার তো দূরের কথা, তুমি নিজেই পারতে না। সেটাই পরখ করতে চেয়েছিলাম আমি!

—সর্দারের সাক্রেদী করতে গিয়ে তাড়ি গিলোনি তো?

বাসু এবং সাধন হেসে উঠল ওর ভীত প্রশ্নে। কিন্তু সতীশ মোটেই অপ্রতিভ হবার ভাব প্রকাশ করল না। তার প্রশ্নের জবাব যে এখনো পায়নি, সেটা খেয়াল ক'রে বলল, তারপর?

—ডাঃ সিংহই বললেন যে বাড়ুয্যে সাহেব তো নেই এখানে! জিজ্ঞাসা করলাম, কুথায় গ্যাসেন টিনি? সর্দার মুখিয়ে বলল, দিল্লীতে বড় বড় সাহেবদের সঙ্গে মোলাকাৎ করতে ইত্যাদি।

সতীশ আর প্রশ্ন করল না। ওর ঠোঁট দুইটা কেমন এক কঠিন সংকল্পসূচক নিস্তব্ধতায় পরস্পরকে চেপে ধরল।

—কেমন লাগছে সাধন?

—অদ্ভুত। এই খনির মধ্যে কোনদিন কুলী হয়ে কয়লা ঠেলতে হ'বে—স্বপ্নেও কি ভাবতে পেরেছিলাম! বিধিলিপি বলেই গ্রহণ ক'রেছি, তা'তে মনের যন্ত্রণাটা একটু ঝিমিয়ে থাকে বোধ হয়।

গলা ভারি হয়ে এল সাধনের। সবাই কতক্ষণ চুপ ক'রে থাকল। বাইরে রাতের অন্ধকারে শীতের হাওয়া চলছে। সে-দিনকার জলের পরে ঠাণ্ডাটা যেন হাঁতের মধ্যে ঢুকতে আরম্ভ করেছে। মাঝে মাঝে কুলী-বস্তি থেকে মত্ত হাসির টুক্‌রা এবং গানের নামে চীৎকার বাতাসে ভেসে আসছে। বৈদ্যুতিক আলো এবং লাল কেরোসিনের ডিবে—দুই-ই জ্বলছে প্রচুর কলিয়ারির দিকে।

—কুলী ধাওরায় গিয়ে থাকবে নাকি সাধন?—প্রশ্ন করল সতীশ।

মোটা কম্বলটা জড়াতে জড়াতে জবাব দিল সাধন—বাংলার নবাব নাকি নাগরার কল্যাণে নিহত হয়েছিলেন, আর আমি মারা যাব এই কম্বলের দায়ে। যা' শীত পড়েছে, ধাওরাতে এই কম্বল দেখলে আমায় যেতে হবে চুরির দায়ে।

—সে আমি সামলাব! কঠোর কণ্ঠে বলল সতীশ।

—কম্বল ছাড়তে না হলে আপত্তি নেই আমার। কিন্তু

বাইরে যাঁ'দের থাকবার যায়গা আছে, তাদের তো কোন বাধ্য-বাধকতা নেই ওখানে গিয়ে থাকবার।

—বাধ্যতা নেই, কিন্তু প্রয়োজন আছে। কুলীদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত আমাদের সাহায্য করতে পারবে। ওদের মধ্যে অতবড় একটা ব্যাপার নিয়ে জটলা হয় নিশ্চয়ই। কি বলে তা'রা? দাদা কক্ষনো জুলুম করতেন না এদের উপর। এরা তাঁকে ভক্তি করতো, ভালোবাসতো।

সতীশের কথা শুনতে শুনতে দাঁড়িয়ে পড়েছিল সাধন। কালো ময়লা খাকী সার্টটা ঝুলানো ছিল কাঠের দেওয়ালে। একটা পিতলের গোল নম্বর আর পেন্সিলে লেখা কাগজের টুক্‌রো নিয়ে এলো সে। সতীশ বা বাসুদেব কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই সে বলল—আমার একদিনের সংগ্রহ। এটা হচ্ছে খনির যেদিকে বিস্ফোরণ হয়েছিল—তার ম্যাপ। খনির ছাদ, পাশের দেওয়াল আমি খুব ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখেছি, এতটুকু ফাটেনি বা ধ্বসে যায়নি। শুধু পূর্ব-উত্তর কোণে মেঝের খানিকটা যায়গা গর্ত মানে অসমান হয়ে গিয়েছিল—তাও সামান্য বল্‌ছি এ-জন্য যে ট্রলি লাইন একটু বসে গেলেও খারাপ হয়নি। বিনা মেরামতেই কয়লা চালান দেওয়া যাচ্ছিল, শুধু দু' যায়গায় খানিকটা ঠেলে। যেখানটায় উল্লেখ-যোগ্য গর্ত হয়েছে—সেখানেও কোন জলটল কিছু জমে নি।

সতীশ প্রশ্ন করল—এর আগে এখানে কোন মেরামতি কাজ হয়নি, জানলে কি ক'রে তুমি?

—সর্দার এবং আরো সবাই বলছিল যে আমরাই আজ প্রথম ঢুকলাম এই দিকে। যাতায়াতের পথটা বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। ডাঃ সিংহও গিয়েছিলেন প্রবেশ-পথ পর্যন্ত।

—তিনি কি বললেন?

—বললেন যে, ভয়ের কোন কারণ নেই।

—কেউ তাঁকে জিজ্ঞাসা করল না যে, পরীক্ষা ক'রে না দেখেই কেন একথা বলছেন ডাক্তার?

—আমিই বললাম। উত্তরে বললেন যে মেরামত দরকার মনে হয়নি। তদন্তের সময় একবার কমিটির সঙ্গে গিয়েছিলেন ভিতরে—তাই ভাল করেই অবস্থাটা জানেন তিনি যে ভয়ের আর কোন হেতু নেই!

—তদন্তের আগে কি হয়েছিল?

—সে-কথা কে বলতে পারবে? মোটেই ভেব না যে আমার মনে কথাটা ঘুরপাক খায়নি। কিন্তু কেউ বলতে পারে না সে-কথা। তবে এটা সত্যি যে, বিশেষ কিছুই হয় নি। মেরামতের চিহ্ন অন্তত থাকতো গহ্বরটার ভিতরে।

—ভুল করছ সাধন! কয়লা-খাতের মেরামত আর সিমেণ্ট করা মেঝের মেরামত এক নয়। জলের গায়ে চিহ্ন থাকে না। তেমনি আবর্জনা, ধূলো, মিশ্‌মিশে কালো কয়লা এবং থম্‌থমে অন্ধকারেও সব দাগ লোপ পেয়ে যায়।

চিন্তিত মুখে সাধন চুপ ক'রে বসে রইল। বাসুদেবের কণ্ঠে

ঘরের নীরবতা ভঙ্গ হ'ল আবার—ঐ পেতলের চাক্‌তিটা কি সতীশ-দা ?

—পেতলের নয় বন্ধু, সোনার চাক্‌তি ওটা। কিংবা তার চেয়েও অনেক দামী। ওর উপর দেখ্‌ছি ৩১ নম্বর খোদাই করা আছে। এটা কা'র জিজ্ঞাসা করেছিলে ?

—এই খনির খাতে যা'রা নামে সে-সব কুলীকেই নম্বর দেয়া হয়ে থাকে। আমার নম্বর পড়েছে ১২৭৩।

—কিন্তু ৩১ নম্বর ছিল কার ?

—আমাদের সর্দারের নম্বরও দেখ্‌ছি ৩১, জিজ্ঞাসা আর তাই করা হয়নি।

—দাদা ছাড়াও একটি কুলী নিহত হয়েছিল। তিনজন হয়েছিল আহত। কিন্তু তাদের কারুর নম্বরই তো ৩১ ছিল না। তুমি সর্দারের নম্বরটা ভাল ক'রে দেখেছ সাধন ?

—হাঁ, অনেকবার নজর করেছি।

—ব্যাপারটা ভয়ানক গোলমেলে ঠেক্‌ছে না কি ? বাড়ুয্যে কাঁচা লোক নয় যে, সর্দারের কোন গোপন হাত 'দুর্ঘটনার' মধ্যে থাকলে আজও সর্দার বেঁচে থাকবে, অথবা বেঁচে থাকলেও থাকবে এখানেই।

—এমন তো হ'তে পারে যে সর্দার অনেকখানি জানে, মানে তা'কে ঘাঁটাতে গেলে বাড়ুয্যে নিজেও ফেঁসে যেতে পারে ?

—সে-ক্ষেত্রে টাকা-পয়সা দিয়ে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়াটাই ছিল একমাত্র নিরাপদ কাজ। লোকটা অসম্ভব

মাতাল, তাড়ি খেয়ে এতদিনে এমন দু'একটা কথা বলে ফেলতে পারতো যা'তে দু'জনেরই বিপদ আসতো ঘনিয়ে। এখানকার নম্বর দেওয়ার ব্যাপারে স্বভাবতই কড়াকড়ি আছে . একজন মরে গেলে বা পালিয়ে বা অন্যত্র সরে গেলে তার নম্বর নিয়ে অন্যকে দিয়ে দেওয়া হয়। যদি কোন নম্বর হারিয়ে যায়, তবে তার সম্বন্ধে বিশেষ তদন্ত ক'রে সে-কথা বইয়ে টুকে রাখা হয়। কিন্তু সেই নম্বর আর দ্বিতীয়বার দেওয়া হয় না। ৩১ নম্বর হারিয়ে গেলে বা চাকতি নিয়েই যদি কেউ চাপা প'ড়ে ম'রে যায় বা ভেগে যায় নাগালের বাইরে তবে ৩১-ক বা খ বা গ নম্বর দেওয়া হয়ে থাকে মাত্র।

—নম্বর হারিয়ে গেলে কি করতে হয়?

—সঙ্গে সঙ্গে জানাতে হয়, যা'তে সে বিষয়ে তাড়াতাড়ি উপযুক্ত তদন্ত হ'তে পারে।

—কেন, শাস্তি-টাস্তি দেওয়া হয় না?

—কিছুমাত্র না। তা হ'লে হারানোর ব্যাপারটা জানতে অসুবিধা ঘটত কর্তৃপক্ষের। কাজেই সেদিক দিয়ে কোন ভয় নেই।

—কিন্তু আমি নিজে খুব ভাল করেই দেখেছি সর্দারের চাকতির নম্বর!

—নূতন কি সেটা? কোনই তফাৎ নেই অন্যান্য চাকতির সঙ্গে?

—না। চাকতি যে কেরাণীর কাছে থাকে, তার সঙ্গে সর্দারের একটা অসম্ভব খাতির লক্ষ্য করেছি আমি। আজ

মাইনে নিয়ে যে গোলমালটা বাধিয়েছিলাম—তখন সেটা বুঝতে কোন কষ্ট হয়নি। আমায় সর্দার যা' বলছিল, কেরাণী তারই পুনরাবৃত্তি করছিল আইন-কানুনের নজীর ফলিয়ে।

—কেরাণী তো দেখলেই সর্দারকে মেনে বা ভয় ক'রে চলে। তা'লে নূতন চাক্‌তি সম্বন্ধে কেরাণী কিছুই জানে না বলতে হবে। তা' ছাড়া কেরাণী কেবল হিসাবই রাখে এর। আসলে এগুলি দেয় তা'র কাছে ম্যানেজার। মাসে কেরাণীকেই এর হিসাব বুঝতে হয় স্বয়ং ম্যানেজারের কাছে।

বাসু হতাশভাবে বলল—তুমি নিজেই আশা সৃষ্টি ক'রে নিজেই তার জাল কেটে বেরিয়ে যাচ্ছ সতীশ-দা'! এর তো কোন মূল্যই নেই দেখ্‌ছি! কিন্তু এমন বাড়তি নম্বরই বা কোথা থেকে এল? পাওয়াও গেল একেবারে সেই ভয়ানক খাতে। অন্য কোন যায়গা কি আর ছিল না খনির মধ্যে?

সতীশ হাসল একটু। বলল—আমার যুক্তির সবটাই গ্রহণ করতে হবে, এমন কোন কথা নেই; বিশেষতঃ আমাদের কাজে। যুক্তি-তর্কের পরে আমার যে অংশটুকু গ্রহণ করা উচিত—সেটুকুই গ্রহণ করবো আমরা, তার বেশী নয়। শুধু একখানা রুমালে ধোবার চিহ্ন থেকে মস্তবড় একটা ট্রেন ডাকাতির আসামীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশ থেকে। এটা তো একটা প্রকাণ্ড জিনিস বাসু! ঠিক লাইনটি বা'র করতে পেলে এ থেকে সূত্র একটা বা'র করা যাবেই এবং এটা যে যায়গাতে পাওয়া গিয়েছে, তা'তে আমাদের

সমস্যার সঙ্গে এর যোগ থাকা অসম্ভব নয়। ১১৭৩ নম্বরটা দাও তো সাধন।

সতীশ চাকতি দু'টাকে পাশাপাশি রাখল কাঠের উপর। পকেট থেকে সরু একটা টর্চ বের ক'রে দু'টোকেই লক্ষ্য ক'রে দেখল। পরে একটা ছোট জিনিস বড় ক'রে দেখবার কাচ বার করল এবং সেটার সাহায্যে অনেকক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলল, সাধনের কাছে একটা বাড়তি চাকতি থাকা উচিত নয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে অতখানি আগের হ'লেও ৩১ নম্বর চাকতিটা পরের তৈরী। কলিয়াবিব নাম ৩১ নম্বর চাকতিতে বেশ ঝরঝরে পরিষ্কার রয়েছে এখনো। আমি এটাকে নিয়ে যাচ্ছি। রাত হচ্ছে বাসু: তুমি আমার সঙ্গে যাচ্ছ তো?

সাধন হেসে প্রশ্ন করল আমার প্রতি কি আদেশ, ক্যাপ্টেন?

—খাতের কাজ একটা গোলমাল ক'রে ছেড়ে দিতে পারো। উপরে শ্রমিকদের কল্যাণ বিভাগ বা মূল দপ্তরে একটা কাজ জুটিয়ে নিতে পারো কিনা দেখ। আসলে শ্রমিকদের মহলে ঘুরে খবর যোগাড় করা একান্ত দরকার। কিন্তু সবার উপরে দরকার নিজেকে নিরাপদ রাখা। কোন রকম সন্দেহের সৃষ্টি করাই হবে চরম বোকামী। আমার সঙ্গে আবার দেখা হবে কয়েকদিন পরে, সাধন! সাবধানে থেকো!

রাস্তায় নেমে এসেই সতীশ বললো—বাসু, আলাদা হয়ে পথ চলো ভাই।

—কেন? অত্যন্ত অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো সে। কোন সন্দেহ হচ্ছে নাকি তোমার?

—এখনো প্রমাণ পাইনি; তবে কিছুই বলা যায় না। আমার উপরে যদি লক্ষ্য রেখে থাকে তবে আমার সঙ্গে তোমাকে দেখলে চিনে রাখবে এবং তোমাকেও করবে নজর-বন্দী এবং তা'তে করে তোমাকে দিয়ে কাজ পা'বার পক্ষে হবে অসুবিধার সৃষ্টি।

—শুধু কি এই?

—না। আমাদের একজনের কোন বিপদ ঘটলেও অন্য জনে কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পাবরে। সাবধান হওয়াটা কাপুরুষতা নয়।

সতীশ নেমে পড়ল পথের কালো অন্ধকারে এর পরেই বেশ খানিকটা আলোকিত অংশ।

বলল,—এখানেই ছাড়াছাড়ি হয়ে যাক্ আমাদেব। তুমি একটা ট্যাক্সী নিয়ে হোটেলে ফিরবে। রাত ক'টা?

বাসুদেবের হাত-ঘড়িটাতে অন্ধকারের সময়ে লেখা পড়া যেত। বলল—সাড়ে সাতটা! কী শীত পড়েছে!

—হাঁ, তুমি যদি পারো তবে টিকেট-কেরাণীর বাসাটা চিনে এবং নামধাম যতটা সম্ভব জেনে নিয়ে ফিরবে

বাসুদেব বেরিয়ে গেল পথের ডান দিক দিয়ে; কলিয়ারি বাবুদের বাসাগুলির দিকে। দূরে একটা বিশেষভাবে আলোকিত ঘর থেকে বেতার-যন্ত্রে গান বাজছিল। সেটাই

এই খনির মৃত মালিকের শেষ কীর্তি। নিজের টাকায় কর্মচারীদের অবসর সময় কাটাবার জন্ম এ-রকম ক্লাব-ঘর, লাইব্রেরী, ব্যায়ামাগার এর চেয়ে অনেক বড় বা পুরাতন সাহেবী কলিয়ারিতেও নেই। রাগ ও দুঃখ একই সঙ্গে অস্থির ক'রে তুলল সতীশকে। অন্ধকারে ওর চোখ জ্বলে উঠল।

...হাঁ, তাই তো, টাকায় কি হয় না ? এমন একটা ক্লাবঘর যেমন হয়, তেমন একটা জঘন্য খুনের তদন্তও চাপা পড়ে যেতে পারে। অদ্ভুত মানুষের মন। অদ্ভুত এই ভালোমন্দে মিশানো পৃথিবী।

বাসুদেব অনেকক্ষণ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। একটুখানি কি ভেবে সতীশ বাঁ'দিকে হোটেলের রাস্তা না ধ'রে সোজা এগিয়ে চলল কুলী-ধাওড়ার দিকে। পকেটের মধ্যে ৩১ নম্বর চাকতিটাকে সে জড়িয়ে ধরল ডান হাতের শক্ত মুঠাতে। দুর্বোধ্য হাসিতে ভ'রে উঠল ওর মুখ। অন্ধকারে হয়ত দাঁতগুলি একটু চক্‌চকে দেখালো।...পিছন থেকে একটা মোটর আসছিল কড়া আলো জ্বালিয়ে। যতটা সম্ভব পথের ধারে গিয়ে দাঁড়াল সতীশ—তীব্র আলো থেকে মুখ আড়াল ক'রে। গাড়িটা কেবলই যেন বাঁ'দিকে সরে যাচ্ছে। সতীশ অবাক হ'ল এই ভেবে যে, এত চওড়া পথ তবু কেন গাড়িটা এত কিনার ঘেঁষেছে ? চাপা দেবে নাকি তা'কে ! খুব তাড়াতাড়ি নেমে গেল সে একবারে পথ ছেড়ে। গাড়িটাও এসে পড়েছিল, আরো খানিকটা বাঁক নিয়ে একটা আর্তনাদ ক'রে উঠল। হয়ত

ড্রাইভার দেখতে পেয়েছিল যে, আর একটু সরলেই পড়ে যাবে নীচে—চূরমার হয়ে যাবে আরোহীসমেত গাড়ি। মুহূর্তমাত্র থেমে ডানদিকে মোচড় খেয়ে উঠল ড্রাইভার পথের উপর এবং ধীরে ধীরে চলে গেল সোজা—বড় বাংলোর দিকে।

প্রথম বিস্ময়ের ঘোর কেটে যেতেই গাড়ির নম্বরটা দেখে নিল সতীশ। একটু ভেবেই সে চমকে উঠল, মুখ থেকে বেরিয়ে এল—ডাঃ সিংহের গাড়ি!—কিন্তু এ-কথাটা কিছুতেই ভেবে পেল না যে, কেন এমন পাগ্‌লা খেয়াল হয়েছিল গাড়িটার। চালক যদি মাতাল হ'ত তবে ঘটনার আগে এবং পরেও তা' প্রকাশ পেত না কি? খুব লক্ষ্য ক'রে সতীশ বুঝল যে—বেশ পাকা হাত না হলে বর্তমান অবস্থা থেকে অক্ষত অবস্থায় গাড়িটাকে উঠিয়ে নিয়ে যেতে পারত না এবং শুধু তা'ই নয়—অমন সোজা চলে গিয়ে গেটের মধ্য দিয়ে বাংলোর গ্যারাজে ঢুকে পড়তে পারত না।

ওর মাথায় ভিতর একসঙ্গে লক্ষ জিজ্ঞাসা টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটতে থাকল যেন।—ঠিক যেমন ক'রে কাণে ঢুকেছিল এইমাত্র তপ্ত মোটর ইঞ্জিনের শব্দ। এত শীতেও তার গরম বোধ হ'ল, ঘেমে উঠল যেন শরীর।

খুব দ্রুত হেঁটে চলল সতীশ কুলী-ধাওড়ার দিকে। ডাঃ সিংহ কি মাঝে মাঝে মাতাল হন? কিছুতেই ঐ মোটর গাড়ির অদ্ভুত ব্যবহারটা মাথা থেকে বা'র করে দিতে পারছিল না।

সতীশ দাঁড়াল নিশ্চল হয়ে। মনকে তা'র শান্ত করতেই হবে। শুধু এ ব্যাপারই নয়, এমন হয়ত আরো আসবে অসংখ্য বাধা, সমস্যা, আক্রমণ। বিচলিত বা উত্তেজিত হয়ে পড়লে তো কিছুই করতে পারবে না! চারিদিকেব মাতাল ঝড়ের মধ্যখানে যে স্তব্ধ কঠোর পাথরের মত দাঁড়াতে না পারবে, তা'র পথ তো নয় এটা! নিজকে সতীশ কঠোর শাসনে সংযত করল: শান্ত করল মনের চঞ্চলতা।

*** কুলী বস্তিতে ঢুকে মন তার অন্য খাতে বয়ে চল্‌বার সুযোগ পেল। অবাক হল সতীশ এদের দেখে। সামান্য মাইনে পেয়ে জীবন তুচ্ছ করে এরা পৃথিবীর অন্ধকার বুক থেকে বলদৃপ্ত আঘাত হেনে বার করে নিয়ে আসে কালো কয়লা। আধুনিক মানব-সভ্যতা কয়লার মত আর কোন জিনিসের কাছে ঋণী নয়। অথচ এরা অশিক্ষিত, অবজ্ঞাত: পেট ভরে ভাল খাবার পায় না পর্য্যন্ত।

কিন্তু এসব চিন্তা করবার সময় পেল না সতীশ। একজন কালো জোয়ান সাঁওতাল কেরোসিনের বাতির নীচে ভূতের মত দাঁড়িয়েছিল—হাঁকলে, কে যাচ্ছিস ইদিক্ দিয়ে?

—আমি, পাশের সাহেবদের কলিয়ারির। মুংরার সনে কথা কইব।

—তা উদিকে কোথা যাবি? আয় আমার সঙ্গে। টলতে টলতে সতীশ এগিয়ে বাতির তলে এসেই নিরর্থক জোরে হেসে উঠল। সাঁওতালটার চেহারা দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল

সতীশের। কালো পাথর কেটে যেন ওস্তাদ শিল্পীর হাতে গড়েছে কেউ সুন্দর মূর্তি একখানা।

মুংরা সর্দারের ঘর বাস্তবিকই কাউকে চিনিয়ে দিতে হয় না: ঘরখানাও একটু বড়, চারদিকে ছোট ছোট ঘরগুলির চেয়ে অভিজাত্য মণ্ডিত। আর হৈ হল্লা যা বেরুচ্ছে তার মধ্য থেকে, তার অর্দ্ধেকও সব ঘর মিলিয়ে কখনও বেরোয় কিনা সন্দেহ। বোঝা গেল যে মুংরা তখন ইহজগতে আর নেই। নেশায় চুরচুর হয়ে সে একটার পর একটা লাটসাহেবী হুকুম ঝেড়ে যাচ্ছে উপস্থিত সবার উপর, আর হাসির কথা হোক্ চাই না হোক্ সঙ্গীরা সব হেসে উঠ্‌ছে নিজেদের বুক চিরে টালির ঘর কাঁপিয়ে।

সতীশ এতটুকু না থেমে দাওয়ার উঠে পড়ল। দরজায় ইচ্ছে করে শরীরটাকে খানিকটা লট্‌কে দিয়ে দড়াম করে দুতিন হাতের উপরেই পড়ল গিয়ে। অদ্ভুত শিক্ষা ওর। এদিকে বিস্মিত হবার অবস্থা কারুরই নেই। নীচে যারা পড়েছিল তারা কোঁ কোঁ করে উঠতেই মুংরা কী একটা সংকেত করল, আর সবাই হোঃ হোঃ করে ঘরখানাকে ঝাকুনি দিলে যেন বিষম একটা। সতীশ বুঝল যে সে অবাঞ্ছিত রূপে গণ্য হয় নি; দলের লোক বা আত্মীয় জনই মনে করছে সবাই তাকে। কিন্তু হুঁসিয়ার সতীশ মুখ খুলল না। কেমন একটা কাজ করে সেই যে শরীরটাকে ছেঁচ্‌ড়ে নিয়ে ঘরের কোণে পোঁটলার মত স্থির হল, না বলল একটি কথা, না নড়ল এতটুকু।

মিনিট তিনচার কাটতেই ওর অস্তিত্বও যেন ভুলে গেল সবাই। আবার ছুটল হাসির ফোয়ারা, ডালমুটের সঙ্গে দেশী দুর্গন্ধ মদ।

হঠাৎ কান খাড়া হয়ে উঠল সতীশের। মুংরা বলে উঠল : খপর্দার শালারা! কেউ যদি বড়বাবুর কথা বলবি দরদ বার করে দেব ঠেঙ্গিয়ে। শেষের কথাটা মুংরার মুখ থেকে বেরুতেই লুফে নিল সবাই, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠেঙ্গিয়ে দিবি সর্দার। একেবারে আচ্ছা করে ঠেঙ্গা হাঃ হাঃ হাঃ :

একজন বলল, ক্যান্ র‍্যা সর্দার ? বড়বাবু কি কাম্‌ড়েছিল তোকে ? এত করল তুদের সবার জন্যে···একথা বলছিস কেনে আজ :

—বলছি কি আর সাধে! বলেই মুংরা ডুকরে কেঁদে উঠল। ওর সেই অদ্ভুত কান্নায় আরো বিকট ভাবে হেসে উঠল লোকগুলি।

সতীশ বুঝল যে এদের কেউ ধাতস্থ নেই। অসংলগ্ন কথা হাসি-কান্না থেকে ওর পক্ষে মূল্যবান কিছুই হয়ত সংগ্রহ করার সুবিধা হবে না। মুংরা তেমনি কেঁদে চলল, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ক্রমেই ঝিমিয়ে আসতে লাগল সে। কলের লোকগুলিও নেশায় কাৎ হয়ে পড়তে লাগল। সতীশ এ খবর আগে থেকেই জেনে নিয়েছিল যে মুংরার বাড়ীতে মেয়েছেলে কেউ নেই। বৌ ওর মরেছে বহুকাল আগে : একটা জোয়ান ছেলে ছিল : বিয়ে করবার পর বছর দুই আগে বাপের সঙ্গে

ঝগড়াঝাটি ক'রে চলে গিয়েছে ভিন্ন কলিয়ারিতে। বাইরের কেরোসিনের বাতিটাতে যথেষ্ট তেল দেওয়া হয় নি দশটার একটু পরেই সেটা নিভে অন্ধকার হয়ে গেল। সতীশ মনে মনে একটু হাসল এই ভেবে যে, কলিয়ারির সব বাতিও যদি দশটা না বাজতেই নেভে, তবু তেলের খরচা খাতায়-পত্রে কিছু কমবে না। মালিকের মৃত্যুর পরে দু' হাতে লুঠ চলছে। কেননা, তিনি বেঁচে থাকতে সাধন তাঁর সঙ্গে দু'বার এসে গিয়েছেন। অবশ্যি তখন বড় বাংলোতেই কেটেছিল তা'র সময়—আর গাড়িতেই দু'একবার ঘুরে বেড়িয়েছে বস্তিটা, মজুরদের অসংখ্য সেলাম কুড়িয়ে। কিন্তু এমন বীভৎস অন্ধকার কখনো অনুভব করেছে বলে মনে পড়ে না তার। আরো খানিক মরার মত চুপ-চাপ প'ড়ে থেকে সে একটু একটু কাতরাতে সুরু করল। কিন্তু এক মুংরা ভিন্ন কেউ কোন সাড়া দিলে না।

ধীরে ধীরে সোজা হয়ে বসল সতীশ। মুংরা একবার বলল—নেশাটা জমল না তোর? তবে খা একটু আরো।

সতীশ প্রশ্ন করল—কোথায়? ঘরের ভিতর খুঁজে দেখি। তুইও আয় না?

মুংরা অতিকষ্টে টলতে টলতে সতীশের সাহায্যে উঠে দাঁড়াল। ভিতরের ঘরে একটা ময়লা তক্তাপোষের উপর মুংরার রাতের খাবার ঢাকা দেওয়া রয়েছে; আর পাশেই রয়েছে একটা হ্যারিকেন আলো। সংসারে তার আপনার জন বলতে ছিল একটা ছেলে। সে-ও রাগারাগি

ক'রে চলে গিয়েছে; কাজ করে পাশের কলিয়ারিতে। আলোটা বাড়িয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সতীশ মুংরার মুখোমুখি। মনে হ'ল আলোটা লাগছে ওর চোখে—কিন্তু মুংরার নেশাটাও কেটে গেল অনেকটা।

—তোকে তো ঠাহর করতে পারছি না। তুই কে রে?

সতীশ কোন জবাব না দিয়ে বাইরের ঘরের সংযোগ দরজাটা আটকাল ভাল ক'রে। একবার দেখে নিল যে পিছনের দিক দিয়ে বেরুবার পথটা মুক্ত আছে কিনা। তারপর এসে তক্তপোষের উপর বসে বলল—কথা আছে জরুরী; একটু বোস্ সর্দার।

—কিন্তুক্ তোকে তো চিনতে পারছিনে।

—বলছি, তুই বোস্ আগে। বোতাম-খোলা ঢিলে ফতুয়াটা ধ'রে টানতেই মুংরা দেহ ছেড়ে দিলে ওর পাশে। যেন দম ফুরিয়ে গেছে এমন ভাবে বলল, বল?

—বলবি তো তুই; সব জেনেও তো চুপ করে আছিস। বড়বাবুকে কেন তুই মারতে গেলি মুংরা? এত সরাপ খেয়েও দুঃখ আমার কমাতে পারছিনা।

সর্দারের শরীরটা যেন ভিতরের শিহরণে কেঁপে উঠল। শক্ত হয়ে আলোর দিকে চেয়ে থেকে পরিষ্কার গলায় জিজ্ঞাসা করল—তুই কে?

—ম্যানেজার সাহেবকে ধানবাদে ধরেছে পুলিসে বড়বাবুর খুনের জন্য; খবর রাখিস?

মুংরা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বসে পড়ল আবার। সতীশ বলল—তোকে-ও ধরবে।

—কেন? আমি কি করলাম!

—তোর নম্বর কত, সর্দার?

—একতিশ্। নম্বর দিয়ে কি হবে? পৃথিবীর আতঙ্ক রূপায়িত হয়ে উঠল ওর কঠিন মুখে। এতকাল বইয়ে পড়েছে, কিন্তু আজ দেখল যে ভয় পেলে সব নেশা কেটে যেতে পারে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই। যদিও মুংরার কথার জড়তা একেবারে কেটে গেল না, চলাফেরার মধ্যে রইল খানিকটা অনিশ্চয়তা, কিন্তু চোখের ঘোলাটে ভাবটা একেবারে সরে গেল। সতীশ বুঝল যে, ওর বুদ্ধির কোঠার দরজা-জানালা-গুলি খুলে যাচ্ছে দ্রুত। আবার জের টেনে জানতে চাইল সে, তোর নম্বর আছে সঙ্গে?

মুংরা হাত টেনে ধরল ওর চোখের সম্মুখে। নম্বর রয়েছে শক্ত সূতো দিয়ে বাঁধা—জ্বল্‌জ্বল্ ক'রে উঠল নূতন চাক্‌তিটা—৩১!

সতীশ পকেট থেকে বা'র করল ওর চাকৃতিটা, এটাও তো ৩১ মুংরা! একই নম্বর!

হতবুদ্ধির মত একটু চেয়ে থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়ল সে নম্বরটার জন্য। সতীশ প্রস্তুত ছিল। সরে গেল।

বলল—উঠে স্থির হয়ে বোস্ মুংরা। আমি কাঁচা লোক নই। নম্বরটা তুই হারিয়ে ফেলেছিলি, এমন হারাতে পারে নম্বর।

কিন্তু এই নম্বরটাই আবার কে দিলে তোকে এ-কথাটাই সত্যি করে বল্ মুংরা। নইলে তোর আর রক্ষা নেই।

—কিন্তুক তুই কোথা পেলি নম্বরটা? ওটা তো আমি কত খুঁজেছি।

—আমরাও অনেক খুঁজেছি সর্দার। খুঁজতে খুঁজতে পেয়েছি গিয়ে অন্ধকার খাতের মধ্যে, ঠিক যেখানে বড়বাবুকে তোরা খুন করেছিলি, সেখানে। তোকে ফাঁসী দিতে কোন অসুবিধা হবে না। এই চাক্তিই প্রমাণ!

মুংরা বিস্ময়ে সতীশের দিকে চেয়ে রইল। কতক্ষণ নির্বাক থেকেই ওর মুখ-চোখ থেকে যেন সব রকম ভাব উবে গেল! ভাষাহীন চোখে চেয়ে রইল মুংরা।

ধীরে-ধীরে বলল—উটা আমার নম্বর নয়।

সতীশ নিজেও যেন কি বলবে খুঁজে পেল না চট্ ক'রে। মুংরা একেবারে বিনা নোটিশে কেঁদে উঠল ছেলেমানুষের মত। কেরোসিনের সেই লাল ধোঁয়াটে আলোর নীচে রুক্ষ সর্দারের কান্না অদ্ভুত ঠেকল সতীশের কাছে। কিন্তু বাধা দিল না সে কোন রকম। মানুষ নিজ থেকে তার বিভিন্ন মানসিক অবস্থার তাগিদে যে-ভাবে যেটুকু বলে, তার মূল্য সতীশের কাছে খুবই বড়। তার কাজের ধর্মই কোন সুস্থির সুদৃঢ় ধারণা মনের মধ্যে পুষে না রাখা। কিন্তু ঐ ৩১ নম্বর চাক্তিটার রহস্য কোন মতেই সে ভেদ ক'রে উঠতে পারছিল না। যতদূর খবর রাখে সে, তা'তে একই নম্বর হু'টো থাকতে পারে না—নেহাৎ ভুল

না হ'লে। অথচ ম্যানেজার থেকে কেরাণী, এমন কি মুংরা পর্য্যন্ত, নম্বর নিয়ে এতবড় ভুল করবে কেন? আর যদি ভুল হয়েও থাকে, তবে ঐ বিশেষ নম্বরটা নিয়েই বা হবে কেন? কলকাতার যেখান থেকে এ নম্বরগুলি এখানে আসত, তা'র ঠিকানা সতীশ সংগ্রহ করেছিল। মুংরাকে খুব বেশী চাপ না দিয়ে সে-দিক দিয়ে চেষ্টা করাই ভাল মনে হ'ল তার।

ঘরের কান্না থামল। মুংরা যেন হঠাৎ চেতনা পেয়ে বলল—পুলিসে ধ'রে নিয়ে যাবে আমাকে?

—নিশ্চয়!

—ফাঁসী দেবে?

—খুব সম্ভব!

—তাই দিক্। বড়বাবু ম'রে গেল—আমারও মরা উচিত! ওরা বলে, গোলমাল করলে ঠেঙাবে। ওরা বলে, খনি এখন ম্যানিজারের।—তা'র ইচ্ছে আমরা কায করি। কে কি ভাবে ওপর দিয়ে কি করল তা' নিয়ে কায কি কুলীদের···

—ম্যানেজার ভয় দেখিয়েছে তোদের?

—উহুঁ। ম্যানিজার কোন কথা বলে না। বড়বাবু বেঁচে থাকতে দু'একটা বলতো। এখন একেবারে চুপ।

—তোদের বলল কে তা'হলে?

—কেরাণীরা বলে।

—ম্যানেজার কেরাণীদের বলে বুঝি?

—আমি শুনিনি কখনো। কেরাণীরা সাহেবের মেজাজ বোঝে তো?

—আর কেউ কিছু বলে না?

—না।

সতীশ ভাবল কিছুক্ষণ। খুব অদ্ভুত ব্যবহার বর্তমান কর্তৃপক্ষের। এই ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠাতা, তা'দের মালিক মারা গেল। অথচ এদের মুখে কথা নেই! বস্তির একটা বুড়ো কুলী মরলেও হয়ত এর বেশী আলোচনা, বেশী জটলা হ'ত। ম্যানেজার এবং ডাক্তার সিংহের কঠোর আত্মসংযমই যদি এর হেতু হয়ে থাকে, তবু একথাটা বুঝা কঠিন যে তা'রাই বা এমন ভাবে নিঃশব্দ থাকবে কেন? ভয় পেল সতীশ। এরকম চুপ ক'রে থাকলে সতীশ তো সামান্য, কেউই হয়ত পারবে না এই মৃত্যু-রহস্য উদ্ধার করতে। তার ধারণা যে প্রত্যেক খুনের ব্যাপারেই খুব হুঁসিয়ার ও বুদ্ধিমান খুনীও এমন দু'একটি সূত্র রেখে যায় যে সন্ধানী চোখে তা' ধরা পড়ে। অথবা যদি এমন কোন কিছু না-ও থাকে, তবু খুনী তা'র নিজ মনের উদ্বেগ বা চঞ্চলতার জন্যই অনুসন্ধানকারীদের উপর এমন কিছু বাহাদুরী করতে যায় যে, তা' থেকেই শেষ পর্যন্ত তাদের দোষ ধরা প'ড়ে যায়।

দৃঢ় ধীর গলায় জিজ্ঞাসা করল সতীশ—একটা কথা বলবি সদার?

—বল।

—বড়বাবু যখন খাতের মধ্যে গেলেন, তখন তাঁর সঙ্গে কে কে ছিল আর ?

—তা'রা হয় মরেছে, নয় জখম হয়েছিল।

—জখমও হয়নি, মরেওনি—এমন ছিল না কেউ ?

মুংরা কথা বলল না। সতীশ বলল— তুই জবাব না দিলেও আমরা জানতে পেরেছি। তুই আর ডাক্তার সিংহ ছিলি বড়বাবুর সঙ্গে !

মুংরা শুধু বলল—আমি ছিলাম। এই খনির মুখ খুলবার পর থেকে বড়বাবুর সঙ্গে সর্বদা থাকতাম আমি। খাতের মধ্যে কোনদিন একা যায়নি বড়বাবু।

—ওখানে গিয়েছিলি কেন ?

—ম্যানিজার বলছিল খাতের ওখানে কায চলবে না। ওদিকে মালের টান পড়ছিল ;—কড়া চিঠি আসছিল রেল সরকারের থেকে।

—কনট্রাক্ট ছিল ?

—হুঁ। ম্যানিজার বলছিল, কাপড়ের কলে কয়লা দিতে হ'বে। তাতেই লাভ বেশী !

—সেই কলের জন্যই বা কেন কয়লা তুলত না সেখান থেকে ?

—সরকারী লোক আসতো দেখতে কি আমরা তুলছি খাত থেকে। খাতের এই মালের পরিমাণ কমাতে সে গিয়ে দেখা করল বড়বাবুর সঙ্গে।

—তারপর ? তারপর কী হ'ল সর্দার ?

—বলছি। বড়বাবুর ঘরে ডাক পড়ল ম্যানিজার আর আমার। সরকারী লোকেরা বসেই ছিল বড়বাবুর ঘরে। আমরা যেতেই দেখলাম বড়বাবু কয়লার হিসাব দেখছে ঝুকে পড়ে। ম্যানিজারকে ধমক দিয়ে বললে এত কম কয়লা উঠছে কেন ? ম্যানিজার বলল—কুলী পাওয়া যাচ্ছে না। সব খরচা যেমন বেড়ে গিয়েছে আর যে দাম আমরা রেলের থেকে পাচ্ছি ...তা'তে আরো বেশী মাল তুলতে গেলে লোকসানে পড়তে হবে। তার দিকে চাইতে ভয় পেলাম আমি। কথাটি কইলাম না। বড়বাবু শুনলাম আবার ম্যানিজারবাবুকে জিজ্ঞেস্ করল, খনির পূব দিকে কায হচ্ছে না কেন ? কুলীর নম্বর তো কমেনি...তবু কয়লা উঠছে কম। বসিয়ে বসিয়ে ওদের মজুরী দিলে বুঝি লাভ হবে আমার ? খনির পূব দিক থেকে কয়লা উঠছে না কেন জানতে চাই !

—বলো সর্দার ! তারপর ?

—ম্যানিজার বলল, ওদিকে গ্যাস উঠছে। ডাক্টর বলছে উখানে কায বন্ধ রাখতে। উখানে গেলে অসুখ করবে।

বড়বাবু ক্ষেপে গিয়ে ধমক দিলে—আমাকে জানাও নি কেনো ? এমন সময় ডাক্টর ঘুরতে ঘুরতে সেখানে এল। এসে হাসল আর কইল, কি খবর ম্যানিজার, ভালো ত ? বড়বাবু তখন ডাক্টরকে ধমক দিলে। ডাক্টর বলল, ম্যানিজারকে সে জানিয়ে রেখেছে। বড়বাবু বলল, আমি কিছু বিশ্বাস করি না।

ডাক্‌টর তখন রাগ ক'রে বলল, আমি একটু দেখেনি—কাল আপনি দেখবেন। বিপদ হতে পারে। বড়বাবু বললেন, না কারু যেতে হবে না, আমি নিজে যাব। ওসব বাজে কথা আমি শুনি না।

তখন তা'ই ঠিক হ'ল। ডাক্‌টর বলল, তোমরা সব শুনে রাখবে। আমার কোন দায় নেই, বিপদ ঘটতে পারে। সরকারী লোকেরাও শুনলে, কিছু বললে না। ম্যানিজার বা'র হয়ে গেল; একটু পরে ডাক্‌টর-ও। পরের দিন আমরা গেলাম সব। বড়বাবু বলল ম্যানিজারকে—ভয় পাও তো এসো না। ম্যানিজার তবু গেল—মুখে গিয়ে ডারিয়ে থাকল। আমরা ভিতরে গেলাম। টর্চ দিয়ে দেখলাম। কোথাউ কিছু নেই ঃ অন্ধকার; সব নিঝ্‌ঝুম। যায়গাটা কী পরিষ্কার—ঝক্‌ঝক্ করছে। বড়বাবু চুপচাপ ডারাল খানিক! কেমন একটা গন্ধ! —গ্যাসের গন্ধ আসছে বুঝি? নাক দিয়ে জোর বাতাস টানতে লাগল বড়বাবু! আবার আমরা টর্চ ঘুরাতে লাগলাম। কোণার মধ্যে দেখলাম ছোট বলের মত কালো একটা কি প'ড়ে আছে—ধোঁয়া বেরুচ্ছে একটু-একটু। সবাই অবাক। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম। বড়বাবু বলল একটা কুলীকে—তুলে ছ্যাখ্ ওটা কি? লোকটা ধরেই ফেলে দিল হাত থেকে—গরম বলে। ছোট্ট একটা আওয়াজ হ'ল—ঢপ্ করে। বল্‌টা ফেটে গেল, না কি হ'ল। চোট লাগল—ছিট্‌কে পড়লাম গিয়ে পূব্ থেকে পচিমের দেওয়ালে। আবার নিঝ্‌ঝুম। বুকের ভিতর

যেন বাতাস যাচ্ছে না। দু'একটা কুলী ধড়ফড় করছে। একটা কাঁতরাছে। অন্ধকার—কিচ্ছু দেখা যায় না। দৌড়লাম কলঘরের দিকে। সরু রাস্তায় ধাক্কা লাগল ম্যানিজারের গায়ে। মারলে একখানা আমায়, আবার পড়ে গেলাম। জ্ঞান হ'ল যখন তখন আমি ডাক্‌টারখানায়। কে মরেছিল, কে জখম হয়েছিল—সব তো তুই জানিস্?

সতীশ মাথা নাড়ল। দীর্ঘ দশদিন ধরে এই দুর্ঘটনার তদন্ত হ'ল। সেই কালো বলের মত কি একটা জ্বল্‌ছিল আর সেটা হাত থেকে পড়তেই হ'ল ক্ষীণ শব্দ একটা; নূতন রকমের একটা বিস্ফোরণ—যা থেকে পাঁচ ছয়টা লোক হয় মরল, নয় জখম হ'ল—তা'র উল্লেখ তো করেনি কোন সাক্ষী! মুংরা তো সাক্ষীই দেয় নি!

—তদন্তের সময় তুই ছিলি কোথা?—প্রশ্ন করল সতীশ।

—কিন, এখানেই!

—সেই বোমার কথা কেউ বলল না?

—বোমা আবার কি বলছিস? ওটা কি কে জানে? অমন ব্যাপার আমি দেখিই নি কোন দিন; শুনিওনি। পূরো দু'ঘণ্টা নাকি খাতের পূব্ দিকখানা ধোঁয়ায় ভরেছিল। পরেও আলো নিয়ে আমি কত খুঁজেছি। একটা টুক্‌রাও সেই বল্‌টার পেলাম না।

—তবু তুই বললি না কেন?

—আমি কিছুই বুঝতে নারলাম। ম্যানিজার বলেছিল তো!

সতীশ চুপ করে থাকল। তদন্ত বৈঠকে কে কি বলেছিল সব মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল সতীশের। মনে পড়ল, যে ম্যানেজার বলেছিল যে কালো রংয়ের কি রকম একটা গ্যাস ফেটে জ্বলে উঠল আর তা' থেকে জ্বলন্ত ধোঁয়ায় খনি ভরে গেল। সে নিজেও আহত হয়েছিল, পড়ে গিয়ে। একথা সত্যি যে সে নিজেও ডাক্তার সিংহের চিকিৎসাধীন ছিল কিছুকাল, দিন পাঁচ ছয়। মুংরার জখম হয়েছিল হাতে; ডান হাতে। কিন্তু সাক্ষ্য দেয়নি সে। একথা কোথাও নেই যে মুংরা সেখানে আদৌ উপস্থিত ছিল। জখম যা'রা হয়েছিল তারা মোটামুটি ম্যানেজারকেই সমর্থন করে গিয়েছিল। কালো একটা বল বা পিণ্ড বা বোমা কেউ হাত দিয়ে তুলেছিল এবং সেটা গরম বলে সে ফেলে দিয়েছিল এবং ফেলে দেওয়ার ফলে ফেটে মৃত্যু ঘটিয়েছিল সেই অন্ধকার গহ্বরে, একথা তো কেউ বলে নি? দুঃখের সেই কালো পর্দা ঠেলে কি একটুখানি আলো চোখে পড়ল সতীশের? তা'র মনে হচ্ছিল মুংরার এই নোংরা ঘরটাও থম্‌থম্ করছে খনির সেই পূব্‌দিকটার মত। ধরা গলায় সতীশ জিজ্ঞাসা করল, ম্যানেজার কোথায় ছিল তখন?

—কখন?

—যখন সেই বল্‌টা পড়ে গিয়ে ঢপ্ করে শব্দ হ'ল?

—অন্ধকার, ঠিক লক্ষ্য করি নি। সাহেবের ভাগ্য ভাল—দূরে ছিল। মরে নি!

—তোরও খুব ভাগ্য ভাল।

—হুঁ। যে চোটে ধাক্কা খেয়েছিলাম, হাত দিয়ে না ঠেকালে মাথাখান্ ছাতু হয়ে যেত'খন।

সতীশ মুচকি হাস্‌ল।

ছাতু হয়ে যাওয়া তো দূরের কথা। বিশেষ কোন আঘাতের চিহ্নই যা'রা মরেছিল তা'দের গায়ে পাওয়া যায় নি। লাস্‌ঘরের রিপোর্টও পরিষ্কার নয়। ডাক্তার সিংহকে তদন্তকারীরা তা'দের রিপোর্টে খুব প্রশংসা করেছেন—এই বলে যে সত্যিকার বৈজ্ঞানিকের মনোভাবের পরিচয় তিনি দিয়েছেন। ঠিক করে কিছু বলা যায় না। এমন অনুরোধও তাঁ'কে করা হয়েছে যে, তিনিই যেন খনির এই দিকটা ভবিষ্যতে পরীক্ষা করে দেখেন এবং তাঁ'র অনুমতি ব্যতিরেকে কেউ আর যেন সেখানে না যায়। বড়বাবুর মৃত্যু সম্বন্ধে তা'রা বলেছে যে যদিও ঝোঁকের মাথায় একটু গোঁয়ারের মতই কায করছেন, তবু তাঁ'র উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। দেশের খুব বড় বিপদের দিনে তিনি আরো বেশী করে যাতে সাহায্য করতে পারেন, এই প্রশংসনীয় উৎসাহেই মৃত্যু হ'তে পারে জেনেও নিজকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন চরম বিপদের মুখে।

মুংরা অবাক হয়ে বলল, হাসছিস যে ?

সতীশ একটু থতমত খেয়ে গেল। হাতটা বুলাল মুখের উপর। এমন অদ্ভুত যে তা'র মনে হল যেন মুখের কোণের সেই বাঁকা হাসিটুকু ঠেকল তার হাতের চেটোয়! একটু থেমে প্রশ্ন করল সতীশ, ডাক্তারকে কোথাও দেখেছিলি, সর্দার ?

—না, শুধু ম্যানিজারের সঙ্গে ধাক্কা লেগেছিল দৌড়বার সময়—গলির মধ্যে।

—গলি ?

—তা'ও জানিস না ? আমাদের খনিটায় পূব-পচিমে তুইটা বড় খাত আছে। মাঝখানে সরু পোলের মত আছে একটা গলি। এই গলিতে টক্কর লেগেছিল ম্যানিজারের সঙ্গে।

—বুঝলাম। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয় নি ; ঠিক মনে আছে তোর ?

—হাঁ। কিন বারবার পুছ্ছিস একটা কথা ?

—কিন্তু সে তো গিয়েছিল নীচে তোদের সাথে ?

—হুঁ। খাতে নামে নি। গলির মুখ পর্যন্ত গেস্ল। বুঝলি ?

সতীশের মুখ অন্ধকার হয়ে এলো, কেরোসিন্ বাতির চিম্নীর মতই। রাত হয়েছিল অনেক। চারদিকে খনির শিরায় শিরায় জ্বলছে তীব্র বৈদ্যুতিক আলো, খোলা বাতাসে উড়ছে কালো ধূলো আর কয়লার গুঁড়া।

সোহাগী বিড়ালের মতই সর্দার সরে আসছিল ওর দিকে ; যেন ঝিমিয়ে পড়তে চাইছে। সতর্ক মানুষ সতীশ। একটু সরে বসল।

নেশাটা যেন আবার চেপে আসছে ওর চেতনার উপর—গোধূলি আকাশে নিকষ কালো জলভরা মেঘের মত। সতীশ ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

তন্দ্রা কেটে গেল সর্দারের। হাঁক দিল, কোথা যাচ্ছিস ?

সতীশ হেসে বলল, মদ খাবি সর্দার ?

ভয়ানক উৎসাহে মুংরা মাথা নাড়ল, গা ঝেড়ে উঠল।

—তা'লে বস্ এখানে। নিয়ে আসি আমি !

সতীশ নির্বিবাদে বেরিয়ে এল। নীরস; কালো, ময়লা কয়লা খাত যেন অসুস্থ তন্দ্রার মাঝে থেকে থেকে কেঁপে উঠ্‌ছে, এলো-মেলো বাতাসটা ওর ক্লান্ত হতাশার দীর্ঘশ্বাসের মত।

শীতের কন্‌কনে বাতাসে একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে শরীরটা খানিক গরম করে নেবে, এই দুরাশায় ছুটে এগিয়ে যেতে লাগল। যেন আর ভাবতে পারছে না। চিন্তায় মাথার ভিতরে রক্ত জমে গিয়েছে ; চিন্তা পারছে না দ্রুত চলতে, যেমন হয় সারাদিন মানসিক পরিশ্রমের পরে দৈহিক পরিশ্রমের অভাব ঘটলে। বড় রাস্তার যেখান থেকে সে নেমে গিয়েছিল বস্তীর পথে, সেখানেই একটা বৈদ্যুতিক আলোর নীচে খানিকটা যায়গায় ধূসর অন্ধকার জমেছিল। কিন্তু তারই একটা অংশ যেন নড়ে উঠল। দাঁড়াল সে। সেই কালো পাহাড়ে-গড়া সাঁওতালটা কি ? কি করছে সে এখানে ? তা'র এতটুকু সন্দেহ রইল না যে লোকটা খুব ভাল মতলবে এত রাত পর্যন্ত খনির চারপাশে ঘুরছেনা। কিন্তু তা'কে যদি কারুর অনুসরণ করবার দরকার থাকত, তবে ঐ রকম একটা লোককেই বা পিছনে লাগাবে কেন ?

সতীশ থামবার সঙ্গে সঙ্গে চলন্ত অন্ধকারের টুক্‌রাটাও স্থির

হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু পিছু হটবার পক্ষে কোন যুক্তি খুঁজে পেলনা সে। যদিও তা'র সঙ্গে যে অস্ত্র আছে—তা' ব্যবহার করা অসম্ভব এক্ষেত্রে, তবু বহুদিনের অভ্যাসের জন্যই বা' হাতটা দিয়ে সে পকেটের মধ্যে হাতিয়ারটার শীতল স্পর্শ অনুভব করল। কঠোর হুকুমের কণ্ঠে ডাকল সতীশ —কে ? কোন জবাব নেই। চারিদিকের শীতল নিস্তব্ধতার মধ্যে আবার প্রশ্নটা যেন ধমক দিয়ে উঠল। লোকটা এতটুকু নড়ল না, সাড়া দেওয়া তো দূরের কথা।

সতীশ ধীরে ধীরে এগিয়ে এল, তোকেই তো দেখলাম সর্দারের ঘরের সাম্নে ?

লোকটা অদ্ভুতভাবে হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল প্রশ্নটা।

—কি চাস তুই ? বলতে হবে !

উত্তরের বদলে এলো আকস্মিক আঘাত। অন্ধকারের মধ্যে ওর দাঁতগুলি একটু চক্‌চক্‌ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল সতীশের উপর। সতর্ক থাকলেও সতীশ পড়ে গেল ; বিষম চোট লাগল কোমরে। ঝম্‌ঝম্‌ করে উঠল সমস্তগুলি স্নায়ু ; চোখের উপর হলুদ আলোর ঝলক্‌। শুধু তাই নয়, কঠোর হাতের কয়েকটা ঘুষিও লাগল এসে চোখে মুখে—কাত্‌ হয়ে গেল সে ডান দিকে। আক্রমণের প্রথম চোট্‌টা সামলে নিতে না পারাতেই আসছিল আঘাত। কিন্তু ডান দিকে শুয়ে পড়তে পারায় সুবিধা হ'ল। বাঁ হাত দিয়ে পিস্তলটা টেনে বা'র করতেই তা'র কাণে এল দ্রুত পদশব্দ—লোকটা চলে যাচ্ছে

পালিয়ে। ঘুরে বসে সে দেখল এখনো সে পিস্তলের পাল্লার মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু এক মুহূর্তও দ্বিধা না করেই ওটাকে ডান পকেটে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে আবার চারদিকটা দেখে নিল—কোথাও কেউ রয়েছে কিনা। কষ্ট হ'ল বেশ সোজা হয়ে দাঁড়াতে। কিন্তু ময়লা-ধূলা ঝাড়তে ঝাড়তে সে এগিয়ে চলল বড় রাস্তার উপর দিয়ে।

এত দুঃখেও ধন্যবাদ দিল সতীশ বিধাতাকে। লোকটাকে যদি গুলী করে বসত, তবে তা'র দুর্ভাগ্যের বোধ হয় আর সীমা থাকত না।

কিন্তু তবু—কে সে, আর কেনই বা আক্রমণ করল তা'কে ?

ওর বেদনাহত কপালে রেখা ফুটে উঠল। কিন্তু একটু পরেই একটা কঠিন দুর্বোধ্য হাসিতে সেগুলি মিলিয়ে গেল। আর ভাবতে পারছে না সে। ইচ্ছে হচ্ছিল এই পথের ধারেই শুয়ে পড়ে। ক্লান্ত দেহটাকে জোরে চালাতেও লাগছিল কোমরে। কিন্তু আর আধ মাইল খানেক রাস্তা তা'কে অতিক্রম করতেই হবে। এত রাতে হোটেলে ফিরলে হয়ত···। তা' ভাবুক।···সতীশ যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি পথ চলতে লাগল।

---

## তিন

"মেটাল প্রডাক্টস্ কোম্পানীর" সচিব মিঃ ঘোষের কাছ থেকে এমন ব্যবহার সতীশ আশা করেনি। যেতেই ভদ্রলোক তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। পাশেই টেবিলের উপর মেলা ফাইল পত্র রয়েছে ; শীতের দিনেও পাখা চল্‌ছে মাথার উপর! এক পাশে একজন ইন্‌জিনিয়ার কতগুলি নীল কাগজে শাদা লাইন্ টেনে হরেক রকমে নক্সা এনে হাজির করেছে। অপর পাশে খাতা পেন্‌সিল নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে আধা-ইংরেজ মেয়ে একটি। কিন্তু মিঃ ঘোষ ওর উপস্থিতিতে যেন টেবিলের তুই পাশ ভুলে গেল একেবারে।

—বস্থন, বস্থন আপনি! কি করতে পারি আপনার জন্য, বলুন তো?

সতীশ বুঝতে পারল যে ভদ্রলোক বাস্তবিকই ব্যস্ত—ভান করছেন না। তবু লোভ সংবরণ করতে না পেরে বলল, আপনি বোধ হয় খুব হালে যোগ দিয়েছেন এই কোম্পানীতে?

—কেন বলুন তো?

—আপনাকে দেখিনি আগে কখনো, তা'ই। তা' ছাড়া ব্যবসার দিকে সত্যিকার দরদ আপনার আছে। বাঙ্গালী বেশীদিন বাংলার 'ভাতজল খেলে তা' থাকে না। তখন হয় দেখায় ভারিক্কিয়ানা, অথবা তুচ্ছ অপমান করে। তা' ছাড়া

আপনার বাংলাভাষা ঠিক বাংগালীর বাংলাভাষা নয়। ও হচ্ছে ভদ্র ইংরাজীর মিষ্টি তর্জমা।

মিঃ ঘোষ সুন্দর গলায় প্রচুর হেসে উঠলেন। সতীশ খুসী হ'ল ভদ্রলোকের অকৃপণ হাস্যে। বুঝল যে মোটেই বিরক্ত হ'ন নি ওর কথায়। মিঃ ঘোষ হাসির জের টেনেই বললেন, আপনি খুব কৌতুকপ্রিয় লোক ব'লে মনে হচ্ছে। হাতের জরুরী কাযগুলি সেরেই নি; তা'লে ভাল করে কথা বলা চলবে, কেমন? আপনি আরো এসেছেন এখানে? আমি কিন্তু একেবারে নূতন নই এ দপ্তরে। মাঝে একবার বাইরে গিয়েছিলাম মাত্র।

সতীশ খুসী হ'ল এই নিতান্ত সঙ্গত প্রস্তাবে। টেবিলের পাশের চেয়ারটা ছেড়ে দিয়ে ঘরের কোণে একটা হেলানো চেয়ারে গিয়ে ছড়িয়ে বসল সে। প্রশংস দৃষ্টি মেলে মিঃ ঘোষ ওকে একটু দেখে নিয়ে বলল, ধন্যবাদ!

সতীশ ইচ্ছে করলে বলতে পারতো আরো অনেক তাক-লাগানো কথা। কিন্তু সেই তাক-লাগানো কথা বলবার দুর্বলতা সাম্‌লে গিয়ে ভালই করেছিল সে। মিঃ ঘোষের কায করবার উৎসাহ কথার বিদেশীয়ানাই শুধু নয়, অফিস্ ঘরের নিখুঁত সজ্জা এবং পরিচ্ছন্নতা এবং ওর নূতন পোষাকের বিলাতি ছাঁটকাট্ গুলিও মিঃ ঘোষের সদ্য প্রত্যাবর্তনের সাক্ষ্য দিচ্ছিল। কিন্তু যখন দেখা গেল যে এসব না বলেও ভদ্রলোকের আন্তরিকতা সত্য, এবং সত্যিকার শিক্ষার নির্ভুল আভাষ পাওয়া যাচ্ছে

এবং তাতে সতীশের চেয়ে তার নিজের কৃতিত্বের অংশও মোটেই কম নয়, তখন সতীশ সে লাইনেই আর গেল না।

অফিস্‌ঘর সাজানোর উদ্দেশ্য শুধু আগন্তুক বা অভ্যাগতদের তাক্ লাগানো নয়। এমন করে এটাকে পূর্ণ করা দরকার যে প্রবেশমাত্র কায করবার উৎসাহ আসে এবং শুধু উৎসাহই নয় প্রসন্ন শান্তিতে মন ভরে উঠে। এখানেই তো জীবনের সব চেয়ে বড় ক্ষেত্র মাথা ঠাণ্ডা রেখে কায করবার! মিঃ ঘোষের দপ্তর শুধু এ দুইটি প্রয়োজনই মিটায়নি; দপ্তরের মালিকের চরিত্রকেও ফুটিয়ে তুলেছে যেন। ঐ লোকটার মতই পরিচ্ছন্ন, নির্মলতর ঘর; সবাক ভাষা কয় সে সব আসবাবে। ঘরের কোণে এই আরাম কৌচখানা যেন মিঃ ঘোষকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে পরিচয় করিয়ে দেয়। সাধনের দাদার কথা আজ বিশেষ করে মনে পড়তে লাগল সতীশের। দাদার সঙ্গে মিঃ ঘোষের তফাৎ অনেক। আসলে সমীর ছিল ভয়ানক জেদী, ভীষণ কর্মঠ মানুষ। একটা প্রকাণ্ড, শক্তিশালী রেলের ইঞ্জিনে এবং পরিচ্ছন্ন পেট্রল চালিত জালি বোটের তফাৎ যেন! সমীর কায করতে পারত অনেক বেশী। শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার মূল্য ও' শুধু বুঝত নয়—এ দুইটিকে জগদ্দলের মত চাপিয়েছিল অধীনস্থ সবার উপর। বয়সে অনেক ছোট হলেও ডাক্তার সিংহ বা ম্যানেজার বাড়ুয্যে শুধু মেনে চলতনা তাকে, বিশেষ ভয়ও করত! যে পথ দিয়ে সমীর চলত, সবাই টের পেত

তার রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দ। কঠোর কাযের লোক অথচ দয়ামায়াও যথেষ্ট ছিল। ভাল করছি তোমাদের, একথা বলে সৎকাজ কখনও সে করেনি! করতে হবেই বলে কায করতে হত সবার কেননা সেটা আদেশ বড়বাবুর বা কর্তার। তা সেটা বিপদজনক কয়লাখনিতে নামাই হোক্ বা হাসপাতাল করাই হোক্!

মিঃ ঘোষ কায করে যাচ্ছে। প্রথমে ইন্‌জিনিয়ারের খসড়াগুলি সে বুঝে নিল। তন্ন তন্ন করে ভুল ত্রুটি অনেক বেরুল। কিন্তু ঘোষ ধমক দিল না ইন্‌জিনিয়ারকে—প্রশ্ন করতে করতে ঠেকাল নিয়ে এমন জায়গায় যে লোকটা নিজে থেকেই বলল যে গোটা দুই খসড়া নূতন করে করতে হবে। তাকে সেদুটা কাগজসহ ঠিকঠাক করে নিয়ে আসতে বলে সুরু করল চিঠি লিখিবার কায। এক এক করে নূতন প্ল্যান্‌গুলি সম্বন্ধে খুব অল্প শাদা কথায় অনেকগুলি চিঠি জলের মত বলে গেল ঘোষ! তারপরে সুরু হল সেদিনকার ডাক। জবাব যেতে লাগল—এটা হবে, ওটা হবেনা—গুদামে তৈরী মাল নেই। একটা মোটা খাতার পৃষ্ঠা উল্‌টে যেতে যেতে যাদের মাল সরবরাহ করবার আশ্বাস বা প্রতিশ্রুতি দিল সে তাদের দামও জানিয়ে যেতে লাগল। আজ ইংরাজ মেয়েটি খুব ভাল শর্টহ্যাণ্ড্ লিখ্‌তে পারে বুঝা গেল। ঘোষের "প্রাইভেট্ সেক্রেটারী"ও হয়ত মেয়েটি। একটা দাম বল্‌বার সময় ভুল হচ্ছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করল। ঘোষ থেমে বলল,

ঠিক আছে। জিনিসটার দাম হালে পড়েছে। পুরোন মাসে আমাদের লোকসান যা'বে। কিন্তু লাভ করতে গেলে বাজারের চেয়ে বেশী দাম নিতে হবে। সেটা কি উচিত? লোকসানের পরিমাণ বেশী নয়—প্রায় সাড়ে চার পার্সেণ্ট। মেয়েটি আর আপত্তি করল না। শুধু বলল, বলুন? চিঠিটা শেষ হল। চলে গেল মেয়েটি।

ঘোষ উঠে দাঁড়াল। সারা মুখে হাসির ঝলক এনে বলল, আপনাকে বসে থাকতে হল। অপরাধ নেবেন না যেন?

সতীশও হাসল। বলল, প্রায় ঘণ্টা খানেক, যদিও হাই তুলতে হয়নি।—বাঁচালেন। এবারে আমি একেবারে মুক্ত ঘণ্টা দুয়ের জন্য। তারপর একটিবার ফ্যাক্টরীতে যাব।

কথাটার ইঙ্গিত বুঝতে দেরী হল না সতীশের। পকেট থেকে সেই ৩১ নম্বর চাক্‌তিটা বের করে বলল, এ নিয়ে আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি। আপনাদের কারখানায় তৈরী।

চাক্‌তিটা হাতে নিয়ে বেল্ দিল একটা। চাপরাশী আসতেই একটা স্লিপ্ লিখে দিল মিঃ ঘোষ। একটা মোটা ফাইল নিয়ে এল চাপরাশী। মালিকের ইঙ্গিত পেয়ে সেটা টেবিলের উপর রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

মিঃ ঘোষ খুব ভাল করে দেখে বলল, হ্যাঁ, আমাদেরই তৈরী। কেন, বলুন তো?

—নিশ্চয় বলবো। আগে বলুন যে কাদের জন্য কতটা এরকম চাক্‌তি তৈরী করেছিলেন আপনারা ?

মিঃ ঘোষের মত লোককে ঠিকমত দেখে শুনে বলে সাবধান করে দেওয়ার কোন দরকার আছে বলে মনে হলো না সতীশের।

খাতাটা দেখে বলল ঘোষ, আমরা দুটি কোম্পানীকে এরকম চাক্‌তি সরবরাহ করে দিয়েছি এ পর্য্যন্ত। একটি কলিয়ারি, অপরটি কাপড়ের কল।

—এটা কার চাক্‌তি, বলতে পারেন কি ?

—নিশ্চয়ই পারি। যদিও বাইরে থেকে আপনারা হয়ত বুঝতে পারবেন না। এটা কাপড় কলে দেয়া হয়েছিল।

—কি করে বুঝলেন ?

—কলিয়ারি আমাদের কাছ থেকে এসব নিয়েছিল যুদ্ধের আগে এবং চাক্‌তিগুলি—যাকে বলেন ভাল কাঁসা—তার তৈরী। এগুলিতে বেশীর ভাগ পেতল। কাঁসার দাম যুদ্ধের সময় ভয়ানক বেড়ে গিয়েছিল, জানেন তো ? তা ছাড়া আমরা কাঁসা তখন সরবরাহ করতেই পারিনি।

—কি পরিমাণ সরবরাহ করেছিলেন, বলতে পারেন কি ?

—খাতা দেখলেই বলতে পারবো! কলিয়ারি যুদ্ধের আগে এক হাজার—যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় আরো এক হাজার। কাপড়-কল হাজার করে পাঁচবার নিয়েছে। মনে হয় যুদ্ধে এই মিল্ অসম্ভব লাভ করেছে। চাক্‌তির জন্য যে রকম

তাগিদ আমরা পেতাম ঘনঘন—তা কেউ ভুলিনি। তা ছাড়া আমরা যখন মজুর পাচ্ছিলাম না, তখন এরা দুমাস অন্তর অন্তর পুরো যুদ্ধের সময় হাজার হাজার শ্রমিক বহুকাল নিযুক্ত করেছিল। কাপড়ের ব্যবসাতে খুব লাভ, এখনও অভাব চল্‌ছে খুবই। কি বলেন ?

—বড়লোকের অভাব কি বলুন ?

—তা সত্যি। তবে আমাকে ও-দলে ফেলবেন না। আমাদের এই কোম্পানী যুদ্ধের সুযোগে উন্নতি করেছে বটে। কিন্তু লাল হয়ে বা ফেঁপে যায়নি।

—সুযোগ নিতে পারেন নি বোধ হয়।

—হবেও বা। শুধু বন্ধুবান্ধবেরাই নয়, ঘরের লোকজন পর্য্যন্ত এ অপবাদ দেন আমায়। মিঃ ঘোষ আবার নির্মল, অকুণ্ঠ হাস্যে ঘরখানা পূর্ণ করে তুললেন।

সতীশ একটু থেমে বলল, এবারে আমাকে বলুন যে এসব চাক্‌তির নম্বর আপনারা কি-ভাবে ফেলেন ?

—কারখানার প্রোসেস্ ?

—না ! সে-দিয়ে আমার কায নেই। আমি শুধু জানতে চাইছি যে এক নম্বর কি দু'টো চাক্‌তিতে দেন ?

—কক্ষনো নয়। তাহলে এর কোন দাম গ্রাহকের কাছেও থাকে না। অবশ্যি চাইলে আমাদের কোন আপত্তি নেই। তবে এঁরা কখনো তা' চাননি বা নেননি।

—এ-বিষয়ে আপনি নিঃসন্দেহ !

—হ্যাঁ। তবে মানুষের ভুল হওয়া অসম্ভব নয়। আমাদের এখানে খুব সযত্নে চেক্ করা হয় এবং পরে আমরা সব ঠিক হয়েছে কিনা তাও গ্রাহকের কাছ থেকে জেনেনি। ওরা কখনো এমন জানান নি যে আমাদের নম্বরে কোন রকম গোল-মাল হয়েছে!

—আরো একটু বিরক্ত করবো আপনাকে। তারপরে এক কাপ্ কাফি খেতে-খেতে আপনার কৌতূহল মিটাবার পক্ষে আমার মোটেই কোন অসুবিধে হবে না।

—খুব সৎ প্রস্তাব। কারণ, আপনি বাস্তবিক আমাকে অত্যন্ত কৌতূহলী করে তুলেছেন আপনার প্রশ্নের প্রাচুর্য।

—বেশ! এই কাপড়ের মিলের নাম-ঠিকানা আমার দরকার। আর এই মিলের কর্ত্তৃপক্ষ কি সরাসরি আপনাদের কাছে এসেছিলেন?

—মিলটার নাম হচ্ছে "নিউ ন্যাশনাল্ টেক্সটাইল মিলস্ লিমিটেড্" এবং অফিস—ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লীতে। এদের শুধু চাক্তি নয়; যুদ্ধের বাজারে ছোটবড় নানা রকম মেসিন্ এবং "পার্টস্"ও আমরা দিয়েছি বহু টাকার। আসলে আমাদের ভারী খদ্দেরের মধ্যে কলিয়ারির মতই এই মিলও একটি। আর এজন্য আমরা কলিয়ারির ম্যানেজার মিঃ ব্যানার্জির কাছে সবিশেষ ঋণী।

—কেন?

—মিঃ ব্যানার্জিই এদের প্রথমে আমাদের কাছে পাঠিয়ে-

ছিলেন। চমৎকার লোক মিঃ ব্যানার্জি। আপনি জানেন না তাঁ'কে? ভদ্রলোক কলিয়ারি সম্বন্ধে একজন বিশারদ ব্যক্তি তো বটেই, তার উপর ধীরে-ধীরে বেশ উন্নতিও করেছেন।

বিস্ময় দমন করে' সতীশ বলল, কি রকম উন্নতি, মিঃ ঘোষ?

—কেন? আমি তে শুনেছি যে মালিক মানে সমীরবাবুর মরবার পরে মিঃ ব্যানার্জিই কলিয়ারির মালিক হয়েছেন। এটাই কিন্তু ঠিক সতীশবাবু! আমাদের দেশের ব্যবসায়ে অনেক কুসংস্কারের মধ্যেই এ-ও একটা যে মালিকের ছেলেই হ'বে মালিক। সত্যিকার পরিচালন-ক্ষমতা ও জ্ঞান যে-সব কর্ম্মচারীর রয়েছে, তা'দের আমরা সহজে অংশীদার করিনে। আমরা বুঝিনে যে এ-রকম লোককে অংশীদার করলে ব্যবসা সহজেই বড় হয়ে উঠে এবং তারপর এটা তো সহজ অংকের বিষয় যে দশ হাজারী প্রতিষ্ঠানের পূরো মালিকানার চেয়ে কোটি টাকার ব্যবসায়ের চার আনার অংশ অনেক বড়।

—ঠিক। কিন্তু আপনি কি চান না মিঃ ঘোষ যে আপনার বার্দ্ধক্যে বা জীবনাবসানে "মেটেল্ প্রডাক্টসের" মালিক হ'বে আপনার ছেলে, বা ছেলে না-থাকলে ভাই বা এমনই কোন আত্মীয়?

—হাঁ এবং না।

—আরো একটু পরিষ্কার করুন আপনার জবাবটা।

—ছেলে বা ভাই যোগ্য ব্যক্তি হলে নিশ্চয় তা'কে প্রতিষ্ঠা করবো। না হ'লে বিক্রী করে দেব যোগ্যতর কোন কর্মচারীর

কাছে—যে কায জানে এবং আমার অধীনে হলেও আমাকে এবং আমার প্রতিষ্ঠানকে বড় করতে সাহায্য করে পরোক্ষে মালিকানার দাবী তৈরী করেছে। আমার আত্মীয়তা বা রক্তসম্পর্কের ক্ষেত্র আমার ঘর, পরিবারের পরিবেশ। এই কারখানা বা দপ্তরে তা'কে টেনে আনাটা তু'পক্ষের প্রতিই অন্যায়!

—মিঃ ব্যানার্জি কি আরো কলিয়ারি কিনছেন নাকি?

—হতে পারে। যুদ্ধের সময় কয়লার মত লাভজনক কারবার খুব বেশী ছিল না।

—কিন্তু তখন তো সমীরবাবু জীবিত ছিলেন?

—সবটা সময় নয়। তা' ছাড়া মিঃ ব্যানার্জি মাইনে এবং কমিশন্ জড়িয়ে রোজগার তো কম করতেন না নেহাৎ। চমৎকার লোক—খুব কম কথা বলেন। আমার ঠিক উল্‌টো। কালও অনেকক্ষণ বসেছিলেন এখানে। কী একটা মোটা তদ্বিরে কল্‌কাতা এয়েছেন।

—মিঃ ব্যানার্জি এখানেই আছেন বুঝি?

—হ্যাঁ। ওঁর সঙ্গে জানা নেই আপনার?

—আছে বই কি। তবে সমীরবাবুর মারফৎ আমাদের পরিচয় হয়েছিল। সমীরবাবু মরে যাওয়ার পরে মিঃ ব্যানার্জির সঙ্গে বিশেষ দেখাশুনা হয়ে উঠেনি। আছেন কোথায় ভদ্রলোক?

—দাঁড়ান।

নোট্ বইটা খুলে মিঃ ঘোষ ম্যানেজারের হোটেলের ঠিকানা বলে মন্তব্য করলেন, কল্‌কাতা এসে ওখানেই থাকেন

তিনি আজকাল। সমীরবাবুর মৃত্যুতে ভদ্রলোক খুবই দুঃখিত। আজকাল যেন আরো কম কথা বলেন।

—হুঁ। প্রায় বোবা হয়ে গিয়েছেন!

দু'জনেই হেসে উঠল।

কিন্তু সতীশ ভিতরে ভিতরে কুণ্ঠিত হয়ে উঠছিল। মিঃ ঘোষকে কি সে ভুল করছে। মনে হ'ল ম্যানেজারের সঙ্গে ভদ্রলোকের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে এবং তা'র বর্ত্তমান অবস্থা-ব্যবস্থা আশা-আকাংক্ষার খবর আরো অনেকটা জানে সে। কিন্তু আর প্রশ্ন করাটা নিরাপদ হবে কি? ওদিকে যা' এরই মধ্যে জিজ্ঞাসা করেছে সে, তা' মিঃ ঘোষ ম্যানেজারকে যদি গল্পের ছলেও বলে ফেলে—তবে হয়ত তা'র বর্ত্তমান কাজে গুরুতর বাধা জন্মাতে পারে। দু'টো উপায় আছে! এক মিঃ ঘোষকে যথাসম্ভব সত্য কথা বলে সাবধান করে দে'য়া। দ্বিতীয়, কিছুই না-বলে গল্পের ছলে এখনকার সব প্রশ্নগুলিকে মুছে দে'য়া—যা'তে এর মধ্যে অসাধারণত্ব আছে বলে ভদ্রলোকের সন্দেহ না-জাগে। কিন্তু শেষের উপায়টি কার্য্যকরী হ'বে বলে মনে হ'ল না সতীশের। মিঃ ঘোষ একটু আগেই বলেছে যে সতীশের কথা শুনে সে বিশেষভাবে কৌতূহলী হয়ে পড়েছে। তা' ছাড়া মিঃ ঘোষ যতই ভাল মানুষ হোক্ বোকা বা অনভিজ্ঞ নয়। এত বড় একটা ব্যবসায় শুধু চালানো নয়—খুব ভালভাবে চালিয়ে সে দিন দিন উন্নতির পথে নিয়ে যাচ্ছে একে। সততা বা ভালোমানষিকে বোকামী বলে সতীশ কখনো ভাবতে শিখেনি।

প্রথম উপায় অবলম্বনের মধ্যেও রয়েছে ভীষণ বিপদের সম্ভাবনা। যে-ভাবে ম্যানেজারের প্রশংসা করে তা'র প্রতি বন্ধুত্ব প্রকাশ করছিল মিঃ ঘোষ—তা'তে সম্পূর্ণ রকমে ব্যবসায় সম্পর্ক-বিহীন সতীশকে সে আপ্যায়িত করতে যাবে কেন ? একথা সতীশ জোর করেই বলতে পারে, তা'র ও মিঃ ঘোষের স্বার্থ এ-ব্যাপারে এতই আলাদা যে, মিঃ ঘোষের প্রশংসা থেকে এ-কথা বলা চলে না, মিঃ ব্যানার্জির স্বরূপ সে জানে বা দু'জনের মধ্যে কোন গোপন যোগাযোগ আছে। মানুষ চিনে নেবার এতটুকু ক্ষমতাও যদি সতীশের থেকে থাকে, তবে সে একথা খুব জোর করেই বলতে পারে, ম্যানেজার এত বোকা নয় যে অ-দরকারে তা'র ব্যক্তিগত কথা (অন্যায় বা অসাধুতার কথা তো অসম্ভব) মিঃ ঘোষকে বলতে যা'বে। মিঃ ঘোষ এত ব্যস্ত ও বড় ব্যবসায়ের মালিক যে কল্‌কাতা থেকে অত দূরে মিঃ ব্যানার্জিকে খারাপ লোক বলে জেনেও তার সঙ্গে স্বার্থের যোগ রাখতে যা'বে না কোন মতেই। তবু সতীশ ঘেমে উঠলে ; মনে হ'ল আরাম কৌচের মধ্যে অসংখ্য পিন্ রেখেছে কেউ !

ভাগ্যের কথা এই যে ঘোষের সেই ইনজিনিয়ার সহকারীটি খসড়া দুইটি সেরে নিয়ে এসেছিল এবং তা' নিয়ে দু'জনের দ্রুত আলোচনা চলছিল। তা'নইলে ব্যাপারটা তলিয়ে ভাববার সময়ও হয়ত সতীশ পেত না। সন্ধানীর জীবনে এগুলিই খুব বড় সমস্যা ; মানুষ চিনবার এবং তা'কে কতটুকু পর্যন্ত নিরাপদে বলা যেতে পারে তা' সঠিক বুঝে নে'য়া। বস্তু বা অবস্থা যতই

কঠিন বা ভয়ানক হোক্ মানুষের মত মানুষের মনকে আর কিছুই এত দোলা দিতে পারে না। তাজমহল তো এত সুন্দর; কত শিল্পীর পরিকল্পনায়, কত মজুরের খাটুনিতে, কত কোটি-কোটি মুদ্রা ব্যয়ে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু একটি অভিনব সৌন্দর্যে মণ্ডিত মানুষের মত কি তা' আমাদের আকুল করতে, আকর্ষণ করতে পারে! হায়রে তাজমহল! সতীশ একটু আগেই যে দপ্তর এবং মিঃ ঘোষের নীরব প্রশংসায় ভিতরে-ভিতরে অনুরঞ্জিত হয়ে উঠেছিল, এখন এই মুহূর্ত্তে তাই তা'কে অপরিসীম উৎকণ্ঠায় আচ্ছন্ন করেছে! কর্পূরের মত উবে গেলেও যদি শান্তি হ'ত—তবু না-হয় সে তেতলার এই জানালা দিয়েই গলিয়ে বাইরে চলে যেত। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় সেটা কসরৎ হিসাবে যতই বিস্ময়কর হোক্, কায হিসাবে হ'বে ততই বোকামী। যদি মিঃ ঘোষ বলে যে এ-রকম অদ্ভুত ব্যবহার করে গিয়েছে একজন অজানা লোক, বাড়ুয্যে সজাগ হয়ে পড়বে মুহূর্ত্তে—আর তা'র পিছনে লেগে যা'বে হয়ত খুনীর মিছিল।

বিভীষিকা দেখলো যেন সতীশ। শিউরে উঠলো তা'র শরীর। পকেট থেকে রুমাল বা'র করে কপাল মুছলো সে। একটা ক্ষীণ সুগন্ধে ঘর ভরে উঠল। সতীশের কঠিন জীবনে গন্ধ-বিলাস জিনিসটি আজও রয়েছে—জরাগ্রস্ত জীবন-শেষে কৈশোরের মধুভরা স্মৃতির মত।

একটা চেয়ারের শব্দে সতীশ একেবারে সুস্পষ্ট রকমে চমকে উঠল। এতটা যে, নিমেষের মধ্যে এই চমকটুকু নিশ্চয়ই সাম্‌লে

দাঁড়ানো মিঃ ঘোষের চোখে পড়েছে মনে করে অনুশোচনায় সতীশের চিত্ত তিক্ততায় ভরে গেল।

মিঃ ঘোষ স্থিরকণ্ঠে বলল, আমার সহকারী চলে গিয়েছে প্রায় দু'মিনিট—টের পাননি আপনি। পাছে আপনার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে, সেই ভয়ে বেল্ দিয়ে কাফির জন্য বেয়ারা ডাকিনি। সহকারীর কাছেই বলে দিয়েছি। দু'চার মিনিটে এসে যা'বে। সতীশের কোনই সন্দেহ থাকল না মিঃ ঘোষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও বুদ্ধি সম্বন্ধে। ঠিক ধরা পড়ে যাওয়ার মতই অসহায় ভাবে চাইলে তা'র দিকে। একটু হেসে ঘোষ বলল, কাফি খাওয়ার ইচ্ছে বা মতটাও কি বদলে ফেলেছেন? সতীশ অবাক হ'ল, মতটা-ও বলছেন যে!

—দেখুন সতীশবাবু, ব্যবসার ক্ষেত্রে কৌতূহল থাকা খুব ভাল। কিন্তু তার প্রকাশ বাইরে দেখান ভয়ানক ভুল। এ-রকম ভুল সাধারণতঃ আমি করিনে। আপনার সম্বন্ধে করেছিলাম এই ভেবে যে আপনি ব্যবসায়ী নন বা ব্যবসার কথা বলতে আসেন নি।

—সে তো সত্য কথা, মিঃ ঘোষ।

—না। আপনি ব্যবসার-চেয়েও একটা জরুরী ব্যাপার নিয়ে এসেছিলেন। আর এখন-যে এমন উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে আপনাকে, তা'র কারণও আমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছি।

—এবার আমার কৌতূহল হচ্ছে এবং প্রকাশও করছি, কেননা ব্যবসায়ীর পর্যায়ে আমি পড়িনে।

—ভাল বলেছেন। কিন্তু মিঃ ব্যানার্জিকে আপনার এই আসা-যাওয়া-আলাপের কথা আমি কেন বলতে যা'বো নিজ থেকে, বলুন ? সোজা, সত্যাশ্রয়ী বণিক আমি। অবশ্য তিনি যদি প্রশ্ন করেন আমাকে—তা'লে বল্‌বো। নইলে বলবো না। কারণ, সেটা আমার ব্যবসায়ে সাহায্য না-করে হয়ত বাধারই সৃষ্টি করবে। আপনার উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় আমি জানতে চাইনে সতীশবাবু !

—আমার বলা উচিত ছিল প্রথমেই।

—তা'তে কোন ক্ষতি হয়নি। আমার যেমন মনে হচ্ছে যে আপনাকে আমি ভুল বুঝিনি এবং যে-দু'চার কথা বলেছি তা' থেকে আমার ব্যবসায়ের কোন ক্ষতি হ'বে না ; তেম্‌নি বলবো আপনিও কোন ভুল করেন নি।

ঝুলানো দরজা ঠেলে ট্রে নিয়ে বেয়ারা ঘরে ঢুকল। একবার মিঃ ঘোষের দিকে নীরবে তাকাল সে। তারপর টেবিলের উপর ট্রে রেখে বেরিয়ে গেল। ঘোষের আহ্বানে এগিয়ে এলো সতীশ। কাফিতে চুমুক দেওয়ার সাথে সাথে আবার প্রসন্ন উৎসাহে তা'র দেহমন সঞ্জীবিত হয়ে উঠল। ধীরে-ধীরে কাফি পান করতে লাগল সতীশ। কিন্তু মিঃ ঘোষ, দেখা গেল, তা'র চেয়েও এ-বিষয়ে আরো অনেকখানি ঢিলে।

সতীশ বিষয়ান্তরে যা'বার এই সুযোগ ছাড়ল না।—রোজই কি এতটা সময় নেন কাফি খেতে ? —জিজ্ঞাসা করল হেসে।

—হ্যাঁ। ধীরে-সুস্থে না-চললে জীবন উপভোগ করা যায়

না সতীশবাবু। আপনি হয়ত ভাবছেন যে ব্যবসাদার মানুষ, সময়ের বিস্তর অকুলান আমার। আসলে, তা'নয়। তা'ছাড়া, তাড়াতাড়ি কায করবার বা করতে পারবার উপায় তাড়াহুড়া করা নয়। কতটুকু কায করা আবশ্যক, সে-টি ঠিকমত জেনে নে'য়া। ব্যবসায়ের যেমন একটা হিসাব রাখা হয়—প্রতি বছর যেমন আয়-ব্যয়ের মোট নামানো হয়, মানুষের জীবনের শেষে কর্ম্মব্যস্ততার একটা হিসাব টানলে দেখতে পাবেন যে শতকরা ৯০ ভাগই ছিল অর্থহীন বা অনাবশ্যক।

—আপনী কৃতী লোক, মিঃ ঘোষ। জীবনের একটা গতিপথ আপনার নির্দ্দিষ্ট করে নিতে পেরেছেন···

—বুঝেছি—আপনি কি বলতে চাইছেন। এ-জাতীয় কথা অনেকেই বলে আমাকে। কিন্তু কোন মতেই ভাল বা সুখী হওয়ায় নীতি আমি ছাড়তে নারাজ—এমন-কি বৃহত্ব বা বড়ত্বের লোভেও না। দু'টোকে মিশিয়ে নিতে পারলে আমাকে দলে পাবেন। শুধু একটিকে বেছে নে'বার যদি প্রশ্ন হয়, তবে আমি বড় হওয়ার জন্য ভাল হওয়াকে ত্যাগ করব না।

—মানুষের জীবন তো ভয়ানক অনিশ্চিত জিনিস, মিঃ ঘোষ।

—অর্থাৎ আপনি বলতে চান যে এতবড় অনিশ্চয়তার মধ্যে থেকেও আমি কেন বা কিভাবে আমার ভাল-মন্দ এমনভাবে বেছে নিয়েছি ?

—হাঁ।

—আমার বেছে নে'য়ার পিছনে আপনার যুক্তিটিই

রয়েছে। যেখানে এত অনিশ্চয়তা, সে'খানে জন্ম-জন্ম খুঁজেও তো একটা নিঃসন্দেহ এবং সুনির্দ্দিষ্ট ভালমন্দ, ছোটবড়র মানদণ্ড পাবো না। কাযেই আনন্দের সঙ্গে, সুস্থির সুখের সঙ্গে যেটুকু আমি নিতে পারছি—তা'ই আমি দু'হাত ভরে' তুলে নিতে চাই। স্বার্থপরতা বলে যদি গাল দেন—তবে অবশ্যি নিরুপায়। শুনে-ছেন বোধ হয় যে জনৈক স্বনামধন্য তৈল ব্যবসায়ী ছোট-ছোট প্রতিযোগিদের খুন করে ব্যবসায়-ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন এই বলে যে, ছোট মাপে এ-ব্যবসায়ে জগতের কোন উপকারই হ'তে পারে না! পরে তিনি সব চেয়ে বড় হয়ে বহু অর্থ পরহিতে ব্যয় করে গেছেন।

আমি খুন করতে চাইনে; যেমন চাইনে দান করে করে দৈহিক মৃত্যুর পরেও মানুষের স্মৃতি ভারাক্রান্ত করে রাখতে। দান করা আমার কায নয়। আমার যা কায তার ভিতর দিয়েই যদি আমার কীর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, হোক্—না-হয়, মাথাব্যথা নেই।

মিঃ ঘোষ কারখানায় যাওয়ার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। সতীশও বিদায় নিল, প্রীতি নমস্কার করে। মেটাল্ প্রডাক্টসের দপ্তর থেকে সতীশ বেরিয়ে এলো অনেকখানি আশা ও আনন্দ নিয়ে। মিঃ ঘোষের মত মানুষও আছে দেশে। আর এমন না হলে কি আর প্রাণহীন, কদর্য্য ধাতুপিণ্ড থেকে মানুষের সহস্র প্রয়োজনের জন্য এমন সুন্দর ঝক্‌ঝকে যন্ত্রপাতি তৈরী হতে পারতো! এর প্রত্যেকটি জিনিসই তো নিখুঁত-

সৃষ্টি। পকেটের চাক্‌তিটাকে আজ হাতের চাপ দিয়ে একটা অজ্ঞাত মমতায় ওর দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

হাতঘড়িতে দেখল তখনো দুটো বাজেনি! তা'লে তো আজই যাওয়া চলে চ্যাটারটন কোম্পানীতে! তার কল্‌কাতা-বিহারের একটা দিন তা'লে কমানো যেতে পারে না কি? আর সেটা আবশ্যক-ও বটে। কেননা তার উপর সে-রাতের সাঁওতাল আক্রমণের পরে সাধনকে ভয়ানক অ-নিরাপদ মনে হচ্ছিল তার। ওদিকে বাসুর শরীরটাও সুস্থ দেখে আসেনি সে। কাছেই একটা খোলা ট্যাক্‌সী যাচ্ছিল আরোহী-বিহীন। সতীশ সেটাকে থামিয়ে মিটার দেখে নিয়ে বলল, ষ্ট্র্যাণ্ড্‌!

এক দিন তো খুবই বেশী সময়। মাত্র দুঘণ্টায় মানুষের জীবন কত বিভিন্ন বা বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভরে উঠতে পারে! "চ্যাটারটন্‌ কোম্পানী" শুধু নামের দিক দিয়ে নয়, তিন বছর আগেও এই নাম-করা—ভারী রসায়ন দ্রব্যাদির বড় আমদানী-কারী ব্যবসায়টি বিদেশীদেরই সম্পত্তি ছিল। সতীশকে তখন সরকারী কাযে একটা তদন্তের ব্যাপারে এই কোম্পানীর মোটামুটি খবর নিতে হয়েছিল।

কার্ড পাঠিয়ে দিয়ে বাইরে সতীশ সাহেবী পোষাকটাকে ঠিকঠাক করে নিতে লাগল যথাসম্ভব। মিঃ ঘোষের সান্নিধ্যে ওর নিজের সম্বন্ধে জাগ্রতভাব যেমন একেবারেই টের পায়নি, এখানে সেটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল খুব বেশী করে। এখানে

একেবারে সম্পূর্ণ আলাদা রকমের অভিনয় করতে হবে এবং তার জন্য তৈরী হ'তে লাগল সে।

চাপরাশী তা'কে নিয়ে গেল বেশ খানিকটা সময় বসে থাকবার পরে। ওর মানসিক উত্তেজনার জন্যই হয়ত সময়ের জ্ঞানটা প্রায় লোপ পেয়েছিল। স্বাভাবিক ও সাধারণ অবস্থায় সতীশ নিশ্চয় রাগ করে চলে যেত।

"চ্যাটারটন্ কোম্পানীর" বড় অংশীদারের ঘরে ঢুকে সতীশ দেখল যে একজন অ-বাঙ্গালী ভদ্রলোক বসে আছেন। সে তার কার্ডে তার সাক্ষাতকারের বিষয়টি বিশেষ গোপনীয় বলে উল্লেখ করেছিল। একটু বিরক্ত হয়েই তা'ই ইংরাজীতে বলল,, সাহেব কোথায়? আমি কি পরে আসব? লোকটা চকৃচকে গালে হাসি টেনে বলল, সাহেবকে দিয়ে আপনার কি দরকার?

—খুব দরকার। আমি অনেক কাযের কথা বলতে এসেছি।

—তা বলেন আমার কাছে। সাহেবের ব্যবসা আমি কিনে লিয়েছি। সাহেবদের এমন অনেক ব্যবসাই আমাদের হাতে আসছে, আরো এসে যা'বে।

সতীশ একটা ধাক্কা খেল যেন। এখনো এই ভারতীয় ব্যবসায়ীশ্রেষ্ঠ তা'কে বসতে বলার কোন প্রয়োজন মনে করেনি। এ-ছাড়া আর কোন দুর্ব্যবহার না-করলেও চেহারাটা দেখে মন ওর বিরূপ হয়ে উঠল। টাকার জন্য বোধ হয় লোকটা না-

করতে পারে এমন কোন কায নেই ; না-বলতে পারে এমন কথা নেই।

সতীশ নরম স্বরে জিজ্ঞাসা করল, কত দিন হল খরিদ করেছেন? কত টাকায় কিনেছেন? এতো খুব খুসীর কথা শেঠ্‌জী!

লোকটা এই কয়টি মাত্র কথায় বিশেষ খুসী হ'ল না, মুখটাকে বিকৃত করে, দ্বিতীয় পা'টাও চেয়ারের উপর অতি কষ্টে টেনে নিল।

সতীশ বলল একটু অপেক্ষা করে, আমি একজন ডাক্তার। ভদ্রপুর কলিয়ারি থেকে একটু দূরেই আমি একটা হাসপাতাল করব···

—খুব পইসা করেছেন বুঝি?

—কেন?

—লাখো টাকা কামাই করলে তো শো টাকা খয়রাত করবেন! কী নাম আপনার?

—কার্ডে লিখে দিয়েছি তো'

—তা' হোবে! কত মাল লেবেন আপনারা?

—ডাঃ সিংহকে জানেন নিশ্চয়ই?

—হাঁ। তিন চারটো ডাক্তার সিংকে জানি!

চ্যাটারটন্ কোম্পানীর একমাত্র মালিক এবং এতবড় ব্যবসায়ের কর্ণধার শেঠ্ হরলাল্‌জী ভুঁড়ি দুলিয়ে তেল্‌তেলে মুখে হাসলে; কালো দাঁতের পাটি পড়ল বেরিয়ে।

সতীশ বলল, আমি ভদ্রপুর কলিয়ারির ডাঃ সিংহের কথা বল্‌ছি আপনাকে। ভদ্রপুর কলিয়ারি আপনাদের বহুদিনের মক্কেল ; আর নেয়-ও ফি সাল বহু টাকার ওষুধ-পত্র।

—তা' হোবে। আজকাল তো কোন ওষুধই পাওয়া যায় না। চালান আসছে না। আমার বিশ লাখ্‌ রুপিয়ার মাল পড়ে আছে দরিয়ার মাঝে। কব্‌ গঙ্গাজীর ঘাটে এসে লাগবে, কোন ঠিকানা নাই। সব্‌ আদমী মাল চাহ্‌তা, মাল কুথা মিল্‌বে ? আমার এত দাম পড়ে যাচ্ছে এখানে উখানে দিতে যে লোকসান পড়ে যাচ্ছে। আমিতো আর 'বেলাক্' করতে পারি না। বুঝেন তো !

সতীশ যা' বুঝবার ঠিকই বুঝে নিল। বলল, আমি ব্যবসা বুঝি, শেঠ্‌জী। সেটা হ'ল এই যে আমার এক পয়সা হলে, আপনারও এক পয়সা হওয়া দরকার !

—আর কেন বলেন মিষ্টার !

ভাবখানা এই যে এমন কথা শেঠ্‌জী জন্মাবধি শোনেন নি। সতীশ আবার বলল, আপনার পুরনো মক্কেল ডাঃ সিংহ আমাকে বলে দিয়েছেন যে, তাঁরা যে সব ওষুধপত্র নেন তার লিষ্টি তো এখানেই মিলবে—সে-দেখে অর্ডার দিলেই চলবে আমার। ও-ছাড়া নাকি চলে না ঐ মুল্লুকে। পুরানো মক্কেল আপনার, তামাম খবর জানে !

—সে তো হতে পারে। বল্‌তে-বল্‌তে শেঠ্‌জী টেবিলের উপর একটা পা তুলে দিয়ে হাঁক দিল, বনোয়ারী !

ছিপ্‌ছিপে্‌ আধ্‌-ময়লা একটি লোক এসে ঢুকল ঘরে। শেঠ্‌জীর মাতৃভাষায় একেবারে দুর্বোধ্য কতকগুলি কথাবার্তা হবার পরে বনোয়ারী ইংরাজীতে বলল সতীশকে তার ঘরে যেতে।

বনোয়ারীকে কাযের লোক বলে বুঝে নিতে সতীশের সময় লাগল না এবং এ-কথাটাও সে ধরে নিল যে আসলে বনোয়ারীই ব্যবসাটাকে চালাচ্ছে।

বনোয়ারীর ঘরে কোন টেবিল-চেয়ার নেই, চারদিক বন্ধ বলেই হয়ত পাখাটা খুলে নেয়া হয় নি। ফরাসের উপর বসতেই বনোয়ারী বলল, ডাঃ সিংহ কোন চিঠ্‌ঠি দেন্‌ নি আপনার কাছে?

হঠাৎ জবাব দিল না সতীশ। সে স্পষ্ট অনুভব করল যে পথটা পিচ্ছিল। থেমে থাকা বরঞ্চ ভাল, তাড়াতাড়ি ছুটতে গেলে আছাড় খাওয়ার সম্ভাবনা ষোল আনা।

বনোয়ারী আবার বলল কথাটা।

এবারে সতীশ অনেকটা ঝাঁপিয়ে পড়বার মত বলে ফেলল, আপনি আমায় চিনতে পারেন নি।

—কেন?

—আপনারা সাহেবের থেকে ব্যবসা কিনে নেবার পরে ডাঃ সিংহ দুবার মাত্র ওষুধ নিয়েছেন আপনাদের কাছ থেকে। দেখা করেছেন একবার—সাহেব চলে যাবার আগ্‌টায়। তখন আমি ছিলাম ছুটিতে, তা'ই আসিনি। এ ছাড়া আমিই তাঁ'র সহকারী।

বনোয়ারীর চোখেমুখে একটা উজ্জ্বলতা এসেই অতর্কিতে মিলিয়ে গেল। অতটা সহজে তার মত লোক ফাঁদে পা দেয় না।

বনোয়ারী নেহাৎ ভালমানুষের মত বলল, আমি আপনাকে আগে দেখিনি কোন দিন। আপনি কি বলছেন তা'ও ঠিক বুঝতে পারছিনে।

—বেশ! আমি ডাক্তার সিংহকে বল্‌বো!

—ডাক্তার সিংহের চিঠিটা দেখ্‌তে পারি কি?

—কেন, শেঠজী আপনাকে বলেন নি এইমাত্র যে চিঠি নিয়ে আসিনি আমি? আমার মনে হ'চ্ছে আপনারা সন্দ' করছেন আমাকে। পরিষ্কার করে বললে অনেক আগেই চলে যেতে পারতাম। সাহেব থাকতে এই কোম্পানীর সঙ্গে সব বন্দোবস্তই করেছিলাম আমি। শুধু কয়েকটা মাত্র জিনিস—তা'ও খুব চড়া দামই দিচ্ছি আমরা। ওর চেয়ে কম দামেই হয়ত সংগ্রহ করতে পারবো। চেষ্টা করে মানুষ এক পয়সা থেকে যদি লাখ টাকা বানাতে পারে, তবে সামান্য কয়েকটা এ্যাসিড আমি আবার যোগাড় করতে পারবো।

কথাগুলির মধ্যে যা'ই থাক্, ওর বলার ধরনে বেশ একটা আন্তরিক ঘৃণা মিশ্রিত রাগ নিশ্চয়ই প্রকাশ পাচ্ছিল। নইলে বনোয়ারীর মত হুঁসিয়ার লোক হঠাৎ নেমে আসত না—সন্দেহ ও কৃপার তেতলা থেকে বন্ধুত্বের সমতলে।

বনোয়ারী বলল, জিনিসগুলি কি আজকালই দরকার আপনার?

আবার রুখল নিজের উৎসাহে সতীশ। একটা অনুমানের উপর ভর করে খুব এগিয়ে গিয়েছে—শক্ত সরু তারের উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার মত! ওপারের খুঁটি প্রায় হাতের নাগালের মধ্যে। কিন্তু অধীরতা বা আগ্রহের আতিশয্য কঠোর ভাবে দমন করল সতীশ। এখানেই তার সবচেয়ে বিপজ্জনক খেলা খেলতে হবে। একটি মাত্র বেফাঁস কথা, এক কণা অন্যায় আগ্রহ আবার হয়ত ঘনিয়ে তুলবে বনোয়ারীর তীক্ষ্ণ মারাত্মক সন্দেহ। সে-দুঃখ রাখ্‌বার স্থান থাক্‌বে না সতীশের। সতীশ বলল, আপনি কি নয়া মানুষ বনোয়ারীবাবু?

—সে আমি জানি। ওষুধগুলি আসল নামে যায় না, হাসপাতালের প্যাকেই মার্কা দিয়ে দি—টিংচার বলে। জানি আমি, বনোয়ারী হাসলো।

—বাক্সের বাইরে মার্কা দিতে আবার ভুল করবেন না যেন। বনোয়ারীর মুখের আলো দপ্‌ করে নিভে গেল। সর্ব্বনাশ হ'ল কি? কল্পনা জীবন্ত হয়ে উঠল সতীশের চোখের সম্মুখে— আর মাত্র দুই-তিন ইঞ্চি এগিয়ে গেলেই তারটা শেষ হয়ে যায়···এখন কি ঘাটে ঠেকে ভরাডুবি হ'বে নাকি? সতীশ এতটুকু-ও ভড়কাবার লক্ষণ দেখাল না বাইরে। তেমনি গম্ভীর মুখে বলল সে, পুরানো আমলে, মানে সাহেবের সময় আসল বাক্সটার গায়ে শুধু আলকাতরার দাগই থাকতো না; কাঠের উপর খোদাই চিহ্ন দেওয়া হ'ত।

—আমরাও তো তা'ই দি!

—কক্ষনো না। আমি ছুটিতে থাকবার সময়ে যে-চালানটা আপনারা প্রথমে দিয়েছিলেন, তা'তে খোদাই মার্কা ছিল না। আর থাকলেও সেটা এত অস্পষ্ট ছিল যে রাস্তার টানা-ঘষায় উঠে গিয়েছিল। অনেক বেগ পেতে হয়েছিল ডাক্তারকে টিংচারের বোতলগুলি উদ্ধার করতে। তা'ও আমি ছিলাম না। নিজ হাতে সব করতে ভদ্রলোক ঘেমে উঠেছিলেন। আমাকে অবশ্য হেসে বলে দিলেন যে, জোরে দাগ করতে আপনারা ভয় পেয়েছেন—যদি ফেটে যায় ?

—সে ভয় একটু-আধটু তো করিই সতীশবাবু !

—বোকা নাকি ! এগুলি এম্‌নিতে কক্ষনো ফাটে না। আনুন না পূরো শিশি, আমি ছুঁড়ে দিচ্ছি আপনার সামনে।—সতীশ চেষ্টা করে এতক্ষণে একটু হাসল।

বনোয়ারী বলল, এবারে ভাল করে দাগ কেটে দেব, দেখবেন।

—একটা কায করতে পারবেন বনোয়ারীবাবু ?

—কি, বলুন ?

—এক পাটি কাঠ খুলে নিয়ে দাগ কেটে বাঁটাল দিয়ে পরে জুড়ে দিতে পারেন। তা'তে আর কোন বিপদের সম্ভাবনাই থাকবে না !

—এটা খুব ভাল কথা বলেছেন। আপনার তারিফ করছি, আপনি পাকা লোক, স্বীকার করতেই হ'বে !

ভয়ানক তীক্ষ্ণভাবে তাকাল সতীশ ওর দিকে। এক্ষুনি যদি

বলে বসে যে সতীশের দৌড় দেখল ; এবারে সে নিজ থেকে না ভেগে পড়লে, মেরে তাড়ানো হ'বে ?

সতীশ একটু চুপ করে থেকে বলল, তা'লে দিন-দশেকের মধ্যেই মাল বুক্ করবেন, বনোয়ারীবাবু !

—তা' করবো। কিন্তু একটা মাত্র আপত্তি আছে আমাদের।

—সেটা কি ?

—কাজটা বিপজ্জনক জানেন তো ? নিশ্চয়ই স্বীকার করেন ?

—করি বই কি !

—আপনাকে চিনি না আমরা কেউ ; না মালিক, না আমি। ডাক্তারবাবুর হাসপাতালের অর্ডার আমরা পেয়েছি। এমন কথা ছিল যে, প্রত্যেকবারই এর সঙ্গে টিংচারগুলিও যা'বে এবং হাসপাতালের ওষুধের সঙ্গেই ওর দামের বিলও করা হ'বে। কিন্তু এ-কথাও ছিল যে প্রত্যেকবারই ওষুধের লিষ্টির শেষ-পাতায় সেই চিহ্নটা ডাক্তারবাবু দিয়ে দেবেন এবং সেটাই হ'বে আমাদের প্রতি ইঙ্গিত। এবারে সেই মার্কা তো নেই।

—নেই বলেই তো আমি সশরীরে উপস্থিত হয়েছি ! না'হলে আমার আসবার কোনই দরকার ছিল না ! খনিতে এর মধ্যেই একটা বিস্ফোরণ হয়ে গেছে জানেন তো ?

—সেই জন্যই মনে করছিলাম যে এবারে বোধ হয় আর চাইছেন না টিংচারগুলি ডাক্তার সিংহ।

—ভুল। আরো দু তিনটে বিস্ফোরণ আমাদের দরকার। সে জন্যই মার্কা না-দিয়ে আমাকে বিশেষ করে পাঠিয়েছেন

তিনি। আপনারা পর-পর লিষ্টি দেখলে জানতে পারবেন যে একই টিংচার সব সময়ে যাচ্ছে না। যখনই কোন পরিবর্তন দরকার হয়েছে, হয় ডাক্তার নিজে অথবা আমি এসেছি। সাহেব চলে যাওয়ার পরে অর্থাৎ আপনাদের একেবারে প্রথম চালানে যেগুলি দিয়েছিলেন এবারে সেগুলিতো দিবেনই—তা' ছাড়া গতবারের চালানের টিংচারগুলিও দিয়ে দেবেন।

—আচ্ছা, কিন্তু দাম তো খুব বেড়ে যা'বে তা'লে। হাসপাতালের বিল যা'বে খুব চড়ে।

—দামটা একটু কমানো দরকার বনোয়ারীজী। এখন তো মোটামুটি সবই আবার আমদানী হতে আরম্ভ করেছে!

—সে শুধু কাগজে পত্রে। আসলে জিনিষ পাচ্ছেন কই?

—তার জন্য আমাদের একটা প্রস্তাব আছে। সব সময় মোটামুটি যে-রকম বিল্ হয়, এবারেও তা'ই করবেন। শুধু বাড়তি টাকাটা আমি নগদ দিয়ে যা'ব। এখনো দিতে পারি, বলুন?

খানিকক্ষণ ভেবে বনোয়ারী কয়েক মিনিটের জন্য শেঠ্‌জীর কাছে চলে গেল। আশঙ্কায় শরীর কণ্টকিত হয়ে উঠল সতীশের। কিন্তু বহু দূর চলে এসেছে সে। আর তো ফিরবার পথ নেই তার। ডান হাতে যেমন পকেটের ভিতর নোটের তাড়াটা ধরল, তেমনি বাঁ হাতে আঁকড়ে ধরল সেই চিরবিশ্বাসের এবং ভরসার প্রতীক তার পুরাতন কিন্তু যত্ন-রক্ষিত

পিস্তলটাকে। মনে হচ্ছে এক যুগ ধরে বনোয়ারী চলে গিয়েছে ঘর থেকে। কে জানে বিধাতার মনে কি আছে! কালো কালো বীভৎস মূর্তি ভেসে উঠল ওর চোখের উপর। কত যেন জঘন্য এবং নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র করছে বনোয়ারী। শীতের অপরাহ্ন, তবু যেন স্যুটের ভিতরটা কালো ঘামে ভিজে যাচ্ছে সতীশের।

বনোয়ারী এলো ঘরের মধ্যে। সঙ্গে এলো আরো একজন, বেশ জোয়ান এবং ষণ্ডা গোছের লোক। সতীশ সরে গেল একটু পিছনে ফাঁকা দেওয়াল রেখে। তারপর···যেন নূতন লোকটাকে দেখতেই পায়নি অথবা পেয়ে থাকলেও, তাঁকে সে মোটেই গ্রাহ্য করে না এমনভাবে বলল, কি ঠিক হ'ল বনোয়ারী বাবু?

—ঠিক হল, টাকা কিছুটা আমরা নেব। এখনই নেব। কিন্তু একটা সর্তে।

—সর্তটা কি, বলুন? সতর্কতা আপনারা অবশ্যই অবলম্বন করতে পারেন।

—আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন, সতীশবাবু! আবার একবার বলবো যে আপনি পাকা লোক। আপনার সঙ্গে কত টাকা আছে?

—খুব বেশী নেই। হাজার দুই টাকা আছে মাত্র।

—বেশ, তাই দিন্। কিন্তু সামান্য একটা সতর্কতা আমরা অবলম্বন করবো তা' আপনার রাগ বা বিরক্তির কারণ হ'লেও

আমাদের ক্ষমা করতে হ'বে। কারণটা আর কিছুই নয়; আপনার সঙ্গে আগে অন্ততঃ একবারও কারবার করলে এ-জাতীয় সতর্কতা আমাদের না-নিলেও চলতো।

—আমি রাজী। আপনাদের এই সতর্কতা অন্যায় তো নয়ই, বরং আমাদের পক্ষেও বিশেষ করে ভরসার কথা।

—ধন্যবাদ! টাকাটা দিন্ তা'লে ?

সতীশ ডান হাতটা বের করে মেলে ধরল বনোয়ারীর সম্মুখে। সেই লোকটা সরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। বনোয়ারী একটা—একটা করে' প্রত্যেকটি নোট পরীক্ষা করে দেখল, কোন দাগটাগ আছে কিনা। কিছুই না-পেয়ে টাকাগুলি সঙ্গের লোকটার কাছে দিয়ে দিল। নিঃশব্দে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল সে।

বনোয়ারী হেসে বলল, আরো আধঘণ্টা এখানে অপেক্ষা করতে হ'বে আপনাকে। একটা ফোন্ আসবে শেঠজীর কাছে, তারপরেই ছুটি আপনার।

—বেশ! একটা খোলা হাসি খেলে গেল সতীশের মুখে।

বনোয়ারী বলল, সিগারেট খান ?

—না, ভাই।

—তা'লে কিছু ঘিয়ে-তৈরী খাবার এনে দি' ?

—তা' দিতে পারেন। ক্ষিদে পেয়েছে।

দু'জনেই হেসে উঠল। বনোয়ারী একটা বেয়ারাকে ডেকে খাবার দেওয়ার কথা বলে দিল।

সতীশের দ্বিতীয় বার চা শেষ হইতেই শেঠ্‌জী নিজেই ঘরে ঢুকে ঘোষণা করল, এবারে যেতে পারেন আপনি। কিছু মনে করবেন না। ডাক্তারবাবুকে আমাদের নমস্কার জানাইয়ে দিবেন। কারবার করে দেখবেন, সাহেবদের থেকে আমরা খারাপ নই।

সতীশ হেসে জিজ্ঞাসা করল, ফোন্ এসেছে আপনার?

—এইমাত্র।

সতীশ-ও হেসে প্রত্যভিবাদন করে দাঁড়াল চোখমুখের সব দরজা-জানালা বন্ধ করে। বাইরের দিকে চলতে-চলতে শুধু বলল, দিন দশেকের মধ্যেই পাঠাবেন। দেরী করবেন না যেন!

খোলা গঙ্গার হাওয়া শরীরে লেগে সতীশের সমস্ত কুণ্ঠা, সমস্ত অস্বস্তি যেন তুলে নিল। এইবারে সাহস করে একবার সে ঘড়ির দিকে চাইল; সময়টা গেঁথে নিল মনের মধ্যে। এর মাত্র তিন মিনিট্ আ'গে ফোন্ এসেছে শেঠ্‌জীর কাছে—"চ্যাটারটন্ কোম্পানী"র নম্বরে। কোথা থেকে? বাঁ দিকে মোড় ফিরেই সে যথাসম্ভব পা' চালিয়ে এল বড় ডাকঘরের কাছে। ঘড়িটা মিলিয়ে নিয়েই ডাইনে ঘুরল—টেলিফোন্ আফিসের দিকে।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে প্রায়; জনশূন্য ডাল্‌হৌসী প্রেতপুরীর মত দেখাচ্ছে! বড়-বড় পাষাণপুরীর আলোগুলি দেখাচ্ছে ভীতিজনক রাক্ষসের জ্বলন্ত চোখের মত।

## চার

দু' দিন পরের কথা।

আবার যাত্রা হল সুরু।

এই দুইটি দিন সতীশ খেয়েছে পেট ভরে ; আর ঘুমিয়েছে। উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে করেছে মাত্র দুইটি। সাধনকে ফিরে আসবার জন্য খবর দিয়েছে। আর ম্যানেজার বাড়ুয্যে কবে কোন্ গাড়িতে ভদ্রপুর ফিরবে—তার খবর নিয়ে সেই গাড়ির সেই কামরাতেই একটা যায়গা করে নিয়েছে চেষ্টা-চরিত্র করে।

ধীরগতি মিক্সড্ গাড়ি ঃ নইলে ভদ্রপুর কলিয়ারির ষ্টেসনে ধরবে কেন ? গাড়ি লিলুয়া ছাড়তেই সতীশ গায়ে পড়ে আলাপ আরম্ভ করল, কতদূর যাবেন ?

হাওড়া ছেড়ে অবধি বাড়ুয্যে কথা বলা তো দূরের কথা, নড়াচড়াও বড় একটা করে নি। সেই-যে জানালা দিয়ে এক দৃষ্টিতে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল, চোখ ফেরায় নি গাড়ির দিকে। বেঁটে, কালো, মাঝবয়সী মানুষটি। ঘাড়ের চুলগুলি খুব ছোট করে কাটা। কানের দুপাশের চুল সবই পেকে শাদা হয়ে গিয়েছে ; মাথার অন্যান্য দিকের চুলে এখনো পাক ধরেনি। স্বল্পভাষী বলেই বাড়ুয্যেকে জানত সতীশ। কিন্তু এতটা রাশভারী ছিল কি আগে ? সতীশ

বাড়ুয্যেকে এর আগে দুবার দেখেছে, সাধনদের বাড়িতে একবার এবং ওর সঙ্গে ভদ্রপুরে বেড়াতে এসে দ্বিতীয় বারে। কিন্তু আলাপ হয়নি কোনবারই—দুবারে সামান্য কয়েক মিনিট মাত্র দেখেছিল। চেহারাটা খুব মনে ছিল সতীশের ; দেখল সেদিক দিয়ে পরিবর্ত্তন না'-হলেও, লোকটা যেন আসলেই বোবা হয়ে গেছে অধুনা।

আরো একটা ষ্টেসন্ পেরিয়ে গাড়ি ছুটতে আরম্ভ করল।

তেম্‌নি বসে আছে বাড়ুয্যে। সতীশ আবার জিজ্ঞাসা করল, কদ্দূর যাচ্ছেন মিঃ ব্যানার্জি ?

একটু চম্‌কে উঠল সতীশের সহযাত্রী। ষ্টেসনের নামটা বলে মুখ টেনে আনল কামরার ভিতরে।

সতীশ খুব মিষ্টি হেসে বলল, অপরাধ মার্জনা করবেন। আমরা দুজনই যাত্রী এ-গাড়ীর। একেবারেই কথাবার্তা হবে না ? সেটাই কি স্বাভাবিক মিঃ ব্যানার্জি ?

—আপনি কোথায় যা'বেন ?

—কানপুর !

আবার একটা মৃদু হাসি ঝিলিক খেলে গেল সহযাত্রীর চোখে।

বাড়ুয্যে মন্তব্য করল, এ-গাড়িতে কি সুবিধা আপনার ? তিন দিন লাগবে আপনার !

—তবু তো শুয়ে বসে যেতে পারব ! মেল্‌ট্রেনে যা' ভীড় ! আপনি বোধ হয় কোন কলিয়ারিতে কায করেন বা মালিক-ও হতে পারেন ?

—কেন, বলুন তো ?

—আপনার নাম দেখলাম রিজার্ভেশন কেরানীর খাতায়, অবশ্য ঐ টিকেটেও লেখা রয়েছে। যাচ্ছেন-ও কলিয়ারি এলাকায় ; আমি একজন মিঃ ব্যানার্জির কথা জানতাম···

—কি করেন তিনি ?

—ভদ্রপুর নামে কোন "মাইন্" আছে কি ?

—আছে। আমি সেখানেই যা'বো। আপনি কি করে জানলেন আমাকে, বলুন তো ?

সতীশ বলল, সমীরবাবু বলে আমার এক বন্ধুর দাদার সে'দিকে একটা ভাল কলিয়ারি আছে বলে শুনেছি। অবশ্য অনেকদিন আগের কথা। তখন তা'দের কাছেই শুনেছিলাম যে কোন্ এক পি. কে. ব্যানার্জি সেই কলিয়ারির ম্যানেজার, খুব যোগ্য লোক। আপনার-ও নাম তাই। নামটা দেখে পুরনো কথা মনে পড়ল। তা'ই শুধোচ্ছিলাম।

—বেশ বেশ, কিন্তু অবাক হচ্ছি, কতকাল আগের কথা বলুন তো ?

—প্রায় পাঁচ ছ'বছর। তখন আমি পড়তাম।

—এতদিনকার একটা তুচ্ছ কথা মনে রয়েছে আপনার ? খুব অসাধারণ কিন্তু।

—হয়ত নয়। কারণ প্রায় পাঁচ বছর পরে কল্‌কাতা গিয়ে পুরাতন বন্ধুবান্ধবদের খোঁজ করতে করতে সমীরবাবুদের বাসায় বন্ধু সাধনের খবর নিতে গিয়ে জানলাম সমীরবাবু নাকি

শোচনীয়ভাবে মারা গেছেন, খনির ভিতর একটা বিস্ফোরণের ফলে। আলোচনা হল খনি সম্বন্ধে। সাধন বলল, খুব লোকসান যাচ্ছে ; আপনি নাকি পরামর্শ দিয়েছেন বিক্রী করে ফেলতে।

—হুঁ। সমীরবাবুর স্থান দখল করবার লোক নেই পরিবারে। নিজেরা দেখতে না-পারলে ব্যবসা টিকে না।

—এই যুক্তির পিঠেই আমি আপনার কথা জানতে চাইলাম। আমি বলেছিলাম যে খুব যোগ্য লোক বলে যে ম্যানেজারের কথা শুনেছিলাম, তিনি কোথায় ? তিনি কি দেখতে পারেন না মৃত মালিকের স্বার্থ ? তখন শুনলাম যে আপনি আজও রয়েছেন ভদ্রপুরে এবং আপনিই দিয়েছেন এ-পরামর্শ।

—খুব অন্যায় বলে মনে হল কি ?

—যুদ্ধের বাজারে কয়লার খনি কি করে সোনার খনি না হয়ে লোকসানে পৌঁছল, মিঃ ব্যানার্জি ?

—আপনি কি করেন জানতে পারি কি ?

—চাকুরী।

—তা'ই আপনাকে বলতে হচ্ছে যে যুদ্ধের বাজারেও ব্যবসা ফেল্ পড়েছে এবং পড়া খুব অসম্ভব নয়। সরকারী নীতি বা নির্ধারিত মূল্য খুব ভাল, আমরা জোর গলায় বলি সবাই। কিন্তু তা' পালনীয় বলে মনে ক'রলে কি করে' লাভ হবে বলতে পারেন ? সমীরবাবু সমস্তটা যুদ্ধে একমাত্র রেল্ কোম্পানী

ছাড়া আর কাউকে কয়লা দেননি। রেল্ সরকারি দরে কয়লা নিয়েছে। অথচ কয়লা তুলবার খরচ পড়েছে তিন গুণেরও বেশী। যোগ বিয়োগ করে দেখুন, লাভ কিংবা লোকসান হচ্ছে ব্যবসায়ে!

হাসল একটু সতীশ।

বাড়ুয্যে তিক্তকণ্ঠে প্রশ্ন করল, হাসছেন যে?

—এম্‌নি। হাসছি এই ভেবে যে এ-প্রশ্নের জবাব নেই। একমাত্র যে দিতে পারতো, সেই সমীরবাবুও আজ মৃত।

—সেজন্য আমরা সবাই দুঃখিত। আমার কথা সাধনবাবুরা বুঝবেন না। সে-কথা আমিই জানি।

—খুবই স্বাভাবিক। আপনারা খনির ছোট অবস্থা থেকে যুক্ত চেষ্টায় তা'কে নাকি খুব বড় এবং আদর্শ প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন। আরো শুনেছি যে ডাক্তার সিংহ করে একজনও নাকি এর মূলে রয়েছেন।

—হাঁ। খুব পণ্ডিত লোক। খুব পরিশ্রমীও বটেন।

—শুনেছি যে ডাক্তারের চেয়েও রাসায়নিক হিসাবে বড় তিনি। আমি রসায়নের সামান্য ছাত্র একজন, কানপুরে একটা কাপড়ের কলের বিভাগে রয়েছি। সুযোগ পেলে নিশ্চয় ডাক্তার সাহেবের সঙ্গে আলাপ করতে আসবো।

—খুব ভাল কথা। আসবেন একবার।

বাড়ুয্যের কথা বন্ধ হল। শুধু বন্ধ নয়, শেষই হয়ে গেল বুঝি। নিভন্ত আগুন উস্‌কে দেওয়ার মত, একটা ষ্টেসন্ পার

হয়ে যেতেই সতীশ বলল, আপনি খুব কম কথা বলেন নাকি ?

বিরক্তি ও বিস্ময় মিশিয়ে অপরিচিত মানুষের এই অনুচিত মেয়েলী প্রশ্নের জবাব না-দিয়ে বাড়ুয্যে একবার চাইল সতীশের দিকে।

সতীশ মোটেই না-হটে বলল, একটা গল্প মনে পড়ছে।

—কি গল্প ?

—এক ট্রেনের একই কামরার মুখোমুখি বসে তুজন ইংরেজ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা থাকা সত্বেও—রোম্ থেকে ক্যালে অব্ধি একটিও কথা না-বলে এসেছিল নাকি। ওদিকে ফরাসীরা নির্বাক লোকের গায়ে সুড়সুড়ি দিয়ে কথা বলায় বলে শুনেছি।

—আপনি কি ফরাসী জাতের লোক ?

—মাপ করবেন, আপনাকেও কিন্তু ইংরেজ বলে ভাবতে পারছিনে আমি। বরঞ্চ আমাদের জাতকে নাকি ফরাসীদের সঙ্গে কতকাংশে তুলনা করা চলে।

—ভুল। ইয়োরোপে আমাদের জ্ঞাতি একমাত্র ইতালিয়ান্‌রা।

—আপনি বাইরে ঘুরেছেন বুঝি অনেক ?

—অনেক বলতে পারিনে। এবার বেড়িয়েছি প্রায় সব দেশেই।

—লণ্ডন টাওয়ার দেখেছেন ? দেখেছেন ইফেল টাওয়ার ? রীমস্ ক্যাথিড্রাল্ ?

বাড়ুয্যে মাথা নেড়ে 'হাঁ' করল। শেষে বলল, আমি বড় ক্লান্ত··· কি নাম আপনার ···হ্যাঁ, খুব ক্লান্ত বিনয়বাবু!

সতীশ একটু হাসল। আসন রিজার্ভ করবার সময় এই নামই ব্যবহার করেছে সে। বাড়ুয্যের সঙ্গে যাবে বলেই।

অনুশোচনা প্রকাশ করল সতীশ ওরফে বিনয়, আপনাকে আর বিরক্ত করবো না মিঃ ব্যানার্জি। মাঝে মাঝে কল্‌কাতা এলে কাজের অছিলায় খুবই ছুটোছুটি নিশ্চয় করতে হয় আপনাকে। আমার দেখুন এবারে বিশেষ করে কষ্ট হচ্ছে আত্মীয়স্বজন ছেড়ে যেতে। অন্যান্যবার এ'রকম বোধ করিনি আমি। ছেড়ে দেব ভাবছি দূর দেশের এই চাক্‌রী। বিহার উড়িষ্যা পর্য্যন্ত তবু আসা যায়। কিন্তু কানপুর···তা' হোক্ না কেন বড় মিল্ আর ভবিষ্যতের আশা। তবু মনেই যদি অশান্তি থাকল তো টাকায় কি হবে বলুন?

—নূতন বিয়ে করেছেন বুঝি?

—না। ও আপদ এখনো ঘটেনি আমার। দিন্ না একটা চাক্‌রী আপনার কলিয়রিতে? বাঃ রে, ও-রকম হাসবার কোন তো কারণ নেই! আমি খুব আন্তরিকভাবেই কথাটা বলেছি আপনাকে।

—খাত থেকে কয়লা তুলতে পারবেন?

—আপনি গরীবের উপর রাগ করেছেন, মিঃ ব্যানার্জি। আমি রাসায়নিক মানুষ। শুনেছি ডাঃ সিংহ বড় বৈজ্ঞানিক লোক; নানা বিষয়ে স্বাধীন গবেষণা করছেন···তাঁ'র সহকারী-

গোছের পদ নেই আপনাদের কলিয়ারীতে ? থাকে তো তা'ই দেন না আমায় ?

—কিসের গবেষণা করবেন আপনি ?

—তেমন কোন স্পষ্ট ধারণা আমার নেই এখনো ! তবু একটা চমকপ্রদ কিছু, যা' আর কেউ করতে পারেনি ; যা'তে সাড়া পড়ে যা'বে পৃথিবীর সর্বত্র !

—এ্যাটম্ বোমার মত ?

—মন্দ কি ! তবে অত মারাত্মক ব্যাপারে যাওয়া বোধ হয় ঠিক হবে না।

—কেন ?

—কাগজে পড়েছি, যে-রকম খরচপত্র হ'বে, তা' কুলান দে'য়ার সাধ্যি আমাদের গরীব দেশে অসম্ভব। তা'র চেয়ে ধরুন ছোটখাটো কোন জিনিস ! হোক্ না বোমার মতই ? আমি অনেকদিন ভেবেছি যে পিস্তলের সব কিছু ঠিক রেখে কোন রকমে যদি ছুট্‌বার সময়কার আওয়াজটা বাতিল করা যেত, তবে এর ব্যবহার হতো আরো অনেক নির্বিঘ্ন। বোমার অসুবিধেটাও সেখানেই। দেখুন, ধ্বংস ক্ষমতা যদিও তা'র খুব, কিন্তু আওয়াজ হয় ভীষণ। তা'তে সবাই সচকিত হয়ে পড়ে ; জানতে পারে একখানা প্রলয় হয়ে যাচ্ছে। কথাটা ভেবে দেখুন ?

খুব কালো গম্ভীর মুখে বাড়ুয্যে বলল, আপনার প্রস্তাবটা কি ?

—আমার প্রস্তাবটা সম্ভব কি অসম্ভব, ঠিক জানিনে। এমন কোন বোমা কি করা চলে না, যা' চারদিকের জিনিসপত্র ভাঙ্গবে না, গুড়ো করবে না—কিন্তু নষ্ট করবে, শুইয়ে ফেলে দেবে? বাতাসের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করবে ভীষণ রকমের; কিন্তু ভয়ানক কঠিন শব্দ কিছু হবে না? শুধু বায়ুস্তরে বিষম গোলযোগ-হেতু ভোঁতা রকমের কোন শব্দ হতে পারে মাত্র। আর তা' মৃত্যু ঘটাবে বিষ বাষ্প ছড়িয়ে; ভেঙ্গে চুরে গুড়ো করে নয়। বিষবাষ্প এবং বায়ুস্তরের আলোড়ন;এ'দুটোকে একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে একটা কিছু দাঁড় করানো যায় না? যেমন মনে করুন—শক্ত মুঠির উপর মোটা করে ভেল্‌ভেট জড়িয়ে ঘুষি মারলে মানুষ মরবে, অথচ বাইরে কোন জখম বুঝা যা'বে না?

—মোটামুটি বুঝলাম। কিন্তু আমি তো বৈজ্ঞানিক নই! ডাক্তার সিংহ হয়ত আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন।

—দিন না একটা চাক্‌রী, তা'লে? যদি এ-জাতীয় কোন কিছু করতে পারি তবে অতুল সম্পদ আর সম্মান পাব। ঠিক নয়? এসব জিনিসই দরকার এখন! দেবেন সুযোগ করে একটু?

—দরখাস্ত করবেন। যদি হয়, চেষ্টা করবো আমি।

—চমৎকার! সত্যি খুব ভালো লোক আপনি!

সতীশ নিজেই ভিতরে-ভিতরে বিস্মিত হচ্ছিল, তা'র নিজের ছেলেমানুষি কথাবার্তা ও ব্যবহারে। বাড়ুয্যের মত রাশভারী মানুষের সঙ্গে এমন গা-ঘেষে গল্প করা তো সহজ নয়।

কিন্তু এ-কথা সে হাড়ে-হাড়ে অনুভব করছিল যে গভীর কূট-বুদ্ধিতে লোকটা অনেককেই ছাড়িয়ে যায়। যেটা তার চেয়েও বড় কথা—সেটা হ'ল নিজের কণ্ঠ, চোখ, মুখের উপর এর শাসন। মনের ভাব এর বাইরে থেকে বুঝা অসম্ভব। ঠিক যেটুকু না-বললে নয়, তা'র বেশী একটি কথাও বাড়ুয্যে বলেনি। ওর শেষের কথাগুলির উত্তরে সতীশ খুবই আশা করছিল যে, বাড়ুয্যের মধ্যে একটা উদ্বেগ বা উত্তেজনা সে লক্ষ্য করতে পারবে। কিন্তু একটা দরখাস্তের কথা বলে এমনভাবে প্রসঙ্গটাকে বন্ধ করে ফেল্‌বে, কখনো ভাবতে পারেনি সতীশ।

কখন সন্ধ্যা হয়েছিল। খেয়াল হতেই সতীশ দেখল যে সহযাত্রী বিছানা ঠিক-ঠাক করছে। ভাবটা এ-রকম যে কামরায় যে দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ আছে, তা' যেন খেয়াল করবার মত কিছু নয়!

সতীশও আর চেষ্টা করল না আলাপ জমাতে। প্রতি মুহূর্তে ভদ্রপুরের পথ গাড়ীর চাকার নীচে ফুরিয়ে আসছে। একটা মৃদু চঞ্চলতা ওর দেহমন আচ্ছন্ন করছে ধীরে-ধীরে। অনেক কথা, অনেক সমস্যা ওর মনের দরজায় ভীড় করে কোলাহল করছে যেন। স্থির হয়ে ভাবা দরকার নয় কি? ওর কল্‌কাতা সফরের সাফল্যের উপর অনেকখানি নির্ভর করছে। কি হবে শেষ পর্যন্ত, কে জানে!

ভাবতে-ভাবতে ঘুম ছুটে গেল সতীশের। বাড়ুয্যে দেখা গেল নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে কাত হয়ে। অন্ধকারের মধ্য দিয়ে

ছুটে চলেছে ওদের গাড়ি। তারার দল ঝাঁক বেঁধে দেখছে মিট্‌মিট্‌ করে মানুষের এই অদ্ভুত বিহার। বাড়ুয্যে এবং সতীশের মত বিভিন্ন লোক একই গাড়ির একই কামরায় পাশাপাশি আসনে রাত্রিযাপন করছে। তারাগুলি যদি হেসে উঠত, তবু অবাক হত না সতীশ। কয়লা-খাত এলাকায় ঢুকে গিয়েছে ওরা। দু'দিকে ছুটে যাচ্ছে বিভিন্ন কোম্পানীর বাতি : কয়লা তুল্‌বার পুলী-কল। খোলা জানালা দিয়ে শীতের হাওয়া ঢুকছিল ; সঙ্গে আসছিল ইঞ্জিনের ধোঁয়া ও ধুলোবালি। কাঁচের পাল্লাটাকে জোর করে চেষ্টা করেও তুলতে পারল না সতীশ। কেউ যেন এগুলির দিকে নজর দেওয়া দরকার মনে করেনি বহুকাল। জাম্‌ হয়ে আটকে আছে খাপের মধ্যে জানলার পাটটা। আরো খানিক টানাটানি, ঝাঁকাঝাঁকি করলে কি হত বলা যায় না। কিন্তু উৎসাহ পেল না যেন সতীশ।......

নিশ্চল বসে রইল সে গুটিসুটি হয়ে। ধীরে-ধীরে ফুটে উঠল পূবাকাশে আরো একটী কর্মব্যস্ত, ধূলি-মলিন, মানুষের শত দুঃখ-দুরাশার রঙ্গীন প্রভাত।

ভদ্রপুরের ষ্টেসন্‌ আর দূরে নয়। আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যা'বে গাড়ি। বাড়ুয্যের ঘুম যেন নিজ থেকেই ভেঙ্গে গেল। একটু স্থিরভাবে চিত হয়ে থাকলো সে, খোলা চোখে গাড়ির ছাদের দিকে তাকিয়ে। বেশ একটা শক্ত দোল্‌ দিয়ে বলবান দেহটাকে লোকটা উঠে দাঁড়াল ; সটান চলে গেল "টয়লেটে।"

ভদ্রপুরের ষ্টেসনে পৌঁছবার মাত্র পাঁচ মিনিট থাকতে এলো

বেরিয়ে। গাড়িটা ষ্টেসনে থামবার বোধ হয় আধ মিনিট আগে ওর বিছানা পত্র সব গুছানো শেষ হ'ল। সতীশ উদ্বিগ্ন হল। বিদায়ের কালে কোন কথাই কি হবে না ওদের মধ্যে? সাধারণ নিয়মে বাড়ুয্যেরই আগে মুখ খোলা দরকার। কিন্তু তা'র কোন লক্ষণই সে দেখতে পেল না। ভোরবেলাকার সামান্য কয়েকটি কাজ এবং সেগুলি করবার সুনির্দিষ্ট ধরন দেখে সতীশ বাড়ুয্যেকে যেভাবে ছকে নিতে পেরেছিল, কাল সন্ধ্যার অতশত এলোমেলো আলাপের মধ্যেও তা' পারেনি।

অগত্যা সতীশই সুরু করল, আপনার পথ ফুরোল, মিঃ ব্যানার্জি। রাত্রে ঘুম হয়েছিল তো?

—ধন্যবাদ!

—নমস্কার। আমি কিন্তু শীগ্‌গিরই আসবো ভদ্রপুরে!

—ভালো কথা।

—গাড়ির বাঁশি বাজছে, মিঃ ব্যানার্জি! আমার কথা যদি একটু দয়া করে' বলেন ডাঃ সিংহের কাছে···

কথাটা সতীশের নিজের কানেও শুনাল বেখাপ্পা। বাড়ুয্যে কোন জবাব দিল না। বাঁশী বাজিয়ে হুস্‌হুস্ করতে-করতে বেরিয়ে গেল গাড়িটা। জানালায় যথাসম্ভব আড় হয়ে বসে সতীশ দেখতে পেল, কলিয়ারি থেকে গাড়ি এসেছে ম্যানেজার তথা মালিককে সমাদরে বড় কুঠিতে নিয়ে যাবার জন্য। বাড়ুয্যে কোনদিকে না-চেয়ে, বহু সেলামের প্রত্যুত্তরে দু'টি আঙ্গুল তুলে ছোট্ট একটু সেলাম জানিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠে

বসলো। তারপরেই পথে উঠল কালো ধূলার ঝড়ঃ কিছু আর দেখ্‌তে পেল না।

পরের ষ্টেসনটা এখান থেকে ন' মাইল দূরেঃ অনেকক্ষণ থামবে গাড়িটা সেখানে। একটা এদিকে আসবার গাড়ির সঙ্গে হবে দৃষ্টি-বিনিময়। একটু উদ্বিগ্ন বোধ করল সে। যদি সময়মত খবর না-পেয়ে থাকে বাস্থ আর উপস্থিত না-থাকে, সেই ষ্টেসনেই তবে বাধ্য হয়ে নেমে পড়তে হবে তাকে। অনিশ্চয়তার বোঝা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে; কামরার মধ্যে পায়চারী করে বেড়াতে লাগল চাপা উত্তেজনায়।

গাড়ির বাঁশী কানে এলো সতীশের; ষ্টেসনে ঢুক্‌ছে।

অধীরভাবে গলা বাড়িয়ে দেখতে চেষ্টা করল সতীশ। লম্বা জংসন্ ষ্টেসনের প্ল্যাটফর্মের একেবারে শেষ মাথায় দাঁড়িয়ে আছে বাস্থ; নূতন দিনের আলো এসে পড়েছে ওর অগোছাল দেহসজ্জার উপর। প্রতি মুহূর্তে দু'জনের ভিতরকার দূরত্ব কমে আসছিল। অদ্ভুত ঠেকল আজ সতীশের চোখে বাস্থকে। লম্বা-চওড়া মানুষ বাস্থ—টক্‌টকে ফর্সা রং। এমনভাবে বাস্থ কোন দিনই ওর চোখে পড়েনি। বাস্তবিক, অত্যন্ত পরুষ এবং স্থন্দর চেহারা ওর। মনটা সতীশের ভরে উঠল তৃপ্তিতে। শুধু দেহ-সৌষ্ঠবে নয়; সাহস ও বুদ্ধিতেও সতীশ ওর জন্য গর্ববোধ করল। শুধু ওর জন্যই নয়—সমস্ত বাংলার জন্য। আজকালকার শোচনীয় স্বাস্থ্য, দুর্নীতি এবং পরাজয়ের মাঝে

বাসুদেব একটা মস্ত ব্যতিক্রম—যেন উদ্ধত জয়স্তম্ভের মত দাঁড়িয়েছে এই ধূলিমলিন জমিতে।

গাড়িটা ভালো করে থামেনি তখনো। বাসু ফুর্‌ফুরে হাল্কা হাওয়ার মত, দোল্‌-খাওয়া তারুণ্যের নিঃসংশয় আনন্দের মত এসে কামরাটাতে ঢুকল! এই মুহূর্তের জন্য সব ভুলে গেল সতীশ যে তা'রা এখানে নিজেদের নিয়োগ করেছে একটা করুণ এবং জঘন্য হত্যা-রহস্য উদ্ধার করতে। বাইরে শীতের ভোরে প্রকৃতির প্রশান্ত প্রাচুর্য শরীরমন জুড়িয়ে দিচ্ছে ঃ রেলের জান্‌লা দিয়ে দেখা যাচ্ছে মাঠে পাকা ফসলের সোনালী মায়া ঃ আলের পথ বেয়ে চলেছে গোরু-মহিষের সারি—পিছনে রাখাল। সম্মুখে ঘরের মধ্যে এসেছে বাসু; তেম্‌নি ভগবানের সার্থক সৃষ্টির মত। ঐ ময়লা ছেঁড়া পোষাকের, ঐ অযত্নে রক্ষিত অগোছাল চুলের ভিতর দিয়েও ফুটে বেরুচ্চে ওর অন্তর-বাহিরের ঐশ্বর্য। ওর গভীর কালো চোখে, ওর সুগঠিত সবল দেহে যে দৃঢ় স্বাস্থ্য ও চরিত্র প্রকাশ পাচ্চে—তা'র কাছে পৃথিবীর সব আজ তুচ্ছ হয়ে গেল যেন। ভাবপ্রবণ মানুষ নয় সতীশ—যদিও একটা কঠোর আদর্শকে জীবনের ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করেছে সে। তবু বাসুকে আজ অমন আচম্‌কা দেখে একবার ভয় জাগল ওর মনে এই বিপদের মধ্যে এই কষ্টের মধ্যে ওকে টেনে এনেছে বলে। কিন্তু পরক্ষণেই আবার উদ্বেল হয়ে উঠল সতীশ। বাসুর জন্যই তো সৃষ্টি হয়েছে দুঃখের শয্যা; দিগন্ত বিলীন বাইরের পথ; তারাভরা অন্ধকার আর

অসীম আকাশ! বাসুকে সে ঠিক নিয়ে চলেছে পৃথিবীর মধ্যে তার সত্যিকার আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য।

ভাষাহীন কবিতার এই রেশ ভঙ্গ করল বাসু। —খবর আছে সতীশ দা'!

—বলো।

—তোমার চিঠি পেয়েই সাধনকে কাল রাতের গাড়িতে রওনা করে দিয়েছি। এতক্ষণে প্রায় পৌঁছে গেল বোধ হয়!

—পৌঁছে খবর দিতে বলেছ ?

—হাঁ।

—ভাল করেছ। তা' নাহোলে আবার দুশ্চিন্তা হত আমাদের!

—আরো একটা খবর আছে। বোধ হয় খুবই বড় খবর।

—কী বাসুদেব ?

—মুংরা পর্শু বিকেলে মারা গিয়েছে।

—মুংরা মারা গিয়েছে!

—হ্যাঁ সতীশ দা'। কিন্তু আমার খুবই সন্দ' হচ্চে যে ওকে মারা হয়েছে খুব অদ্ভুত কৌশলে।

—কেমন ? নিরুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করল সতীশ।

—অতিরিক্ত মদ খেয়েছিল, তা'থেকে একটা বিষক্রিয়া হয়ে দমটম বন্ধ হয়েই নাকি মারা পড়েছে সে।

—বাহাদুরী আছে, বাসুদেব। মুংরাকে এর চেয়ে আর কোন রকমেই খুন করা উচিত হত না!

—আমাদের কি খুব ভুল হয়ে যায় নি সতীশ দা' ? মুংরার মৃত্যু মানে খুব বড় একখানা সাক্ষ্য লোপ পেয়ে গেল ! ওকে সরিয়ে রাখা উচিত ছিল আমাদের।

সতীশের মুখে মেঘভারাক্রান্ত হয়ে উঠল যেন। কোন জবাব দিল না।

বাসুর কণ্ঠ আবার কামরার মধ্যে আঘাত করল, তোমার কি কানপুর যাওয়া কোনমতেই আজ বন্ধ থাকতে পারে না ?

—উহুঁ। আমি জানতাম মুংরার বিপদ আসছে। কিন্তু এত শীগ্‌গির আসবে তা' ভাবি নি। অথচ পরিষ্কার বুঝতে পারছি ভুল হয়েছিল আমার ঃ মারাত্মক ভুল। তুই জানিস নে বাসুদেব যে এক হিসেবে আমিই হত্যা করেছি মুংরাকে !

—সে কী কথা সতীশ দা' ?

—হ্যাঁ, ভাই। সে-রাতে ওখানে আমার যাওয়াতেই ব্যাপারটা এত এগিয়ে এসেছে। আমার কথাবার্তা কেউ শুনতে পায়নি—এমন ধারণা অবিশ্যি এখনো রয়েছে আমার। কিন্তু···

—তুমি কি মনে কর না যে মুংরার মৃত্যুতে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে ভদ্রপুরে যে অন্ততঃ একটা দিন এখানে তোমার থেমে যাওয়া উচিত ?

—না। আমার সঙ্গে আজ ম্যানেজার বাড়ুয্যেও এই একই কামরায় কল্‌কাতা থেকে ফিরেছে। আগের ষ্টেসনে নেমে গেল সে।

—সেটা কি আরো কারণ নয় তোমার থাকবার ?

—আমি তোমার উপরেই নির্ভর করতে পারি। আচ্ছা, সুরতহাল রিপোর্ট সম্বন্ধে কিছু খবর পাওয়া গিয়েছে ?

—কোন পরীক্ষাই করা হয় নি। ডাক্তার সিংহ এটাকে অতিরিক্ত মদ খাবার জন্য মৃত্যু বলে রায় দেবার পরে ওকে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে।

—সর্ব্বনাশ ! তারপর ? সর্দারের হাতের সেই চাক্‌তিটার কি হয়েছে ?

—তুমি তো জানতে মুংরার এক ছেলে ছিল ; রাগারাগি করে যে চলে গিয়েছিল পাশের কলিয়ারিতে চাক্‌রী নিয়ে ? ছুটলাম তা'র কাছে। তা'কে সব কথা বললাম।

—কি বল্‌লে বাসু ? ধমক দিয়ে উঠল সতীশ। আকস্মিক এই অধীরতা ও রাগের প্রকাশে বাসু চম্‌কে উঠল। সতীশ কঠোর ভাবে বলল, কি-কি বল্‌লে সব অবিকল বলো বাসু ! কে জানে কি সর্ব্বনাশ করে বসেছ তুমি ?

বাসু বলতে লাগল, গিয়েই ওকে পেলাম ওর ঘরে। কথাটা বলে দেখলাম যে খবর পেয়ে গেছে সে এবং এদিকে আসবার জন্য তৈরী হচ্চে। আমি বেগতিক দেখে বললাম যে মুংরার স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নি। তা'কে গোপনে মদের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে খাইয়ে খুন করা হয়েছে। একেবারে জ্বলে উঠে সে শুধাল, আমি কি করে জানলাম এ-কথা ?

—খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন, বাসু ! এজন্য প্রস্তুত থাকা উচিত ছিল তোমার।

—ছিলাম বৈকি! বললাম, ক'দিন আগে মাত্র মালিক ও-ভাবে মরল। মুংরা তা'র খুব পেয়ারের লোক। জীবনের পঞ্চাশ বছর অত মদ গিলে কিছু হল না, হঠাৎ আজ এমন করে মরে গেল! কথাটা মনে ধরল যেন ওর। আমি যোগান দিতে লাগলাম, সন্দেহ হচ্ছে আমার—সত্য ঘটনাটা যা'ই হোক্। তুই গিয়ে পুলিসে একটা এজাহার দে। যা হয়ে গিয়েছে—তা'তো আর ফিরছে না। তবু যদি কোন অপরাধী এর পিছনে লুকিয়ে থেকে থাকে তো হয়ত ধরা পড়তে পারে।

—তোমার কোন পরিচয়ই চাইল না সে?

—চেয়েছিল।

—কি বল্‌লে?

—বল্‌লাম, ঝরিয়া কল্যাণ সমিতির লোক আমি। কলিয়ারির মজদুরদের সুখদুঃখের তদারক করা আমার কায।

—বিশ্বাস করল? কল্যাণ সমিতির লোকেরা ওদের কোন কল্যাণই তো করে না!

—শত হ'লে-ও ছেলে, সতীশ দা'। একে বাপের মৃত্যু ওকে একটু হ'লেও বিচলিত করেছে, তার উপর একজন ভদ্রলোকের ছেলে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিচ্ছে। নিজ সংস্কারবশে প্রশ্ন অবিশ্যি করে যাচ্ছিল; কিন্তু আমার জবাবগুলি ওর কানে ঢুকলেও মনে পৌঁছাচ্ছিল কিনা হলফ্ করে তুমিও বলতে পারবে না।

হাসল একটু সতীশ—অত্যন্ত ম্লানভাবে তাগিদ দিল, বলো তারপর!

—আমার সঙ্গেই থানার কাছ পর্যন্ত গেল। আমি বুঝালাম অনেক যুক্তি দেখিয়ে যে আমার ওর সঙ্গে থানায় যাওয়া তো দূরের কথা এজাহারের কোথাও আমার কথা বলা উচিত হবেনা ওর। যদি বলবার মতলব থাকে তো ওর থানায় না গিয়ে তাড়াতাড়ি আমার সঙ্গে এসে মৃতদেহের গতি করাই উচিত। কি ভাবল কতটা সময়। পরে বলল, তুই থাক্‌গে ঐ তালগাছগুলির নীচে। আমি এজাহারটা দিয়েই তোর কাছে আসব। প্রায় আধঘণ্টা পরেই বেরিয়ে এলো। ছুটলাম দু'জনে ভদ্রপুরের দিকে। দারোগা নাকি ওকে বলে দিয়েছিল যে-কোন উপায়ে লাস-পোড়ানো ঠেকাবার জন্য !

—সঙ্গে সিপাই দিলে না ?

—একটু পরেই ছোট দু'টো পার্টি নিয়ে দারোগা গাড়িতে এল। একদল আমাদের পিছন-পিছনই এসে পৌঁছল শ্মশানের দিকে। দারোগা নিজে গিয়েছিল মুংরার ঘর তল্লাসী করতে। মুংরাকে যে তা'র ঘরেই সকালে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, সেটা নাকি বারবার জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়েছিল দারোগা।

—চমৎকার ! দারোগাটি বুদ্ধিমান, বাস্থু !

—হ্যাঁ। পরে দেখলাম-ও তা-ই। আমরা গিয়ে দেখলাম চিতা প্রায় নিভে এসেছে। ছেলেটী হতাশভাবে বসে পড়ল, পথের উপর ধূলো উড়াতে-উড়াতে সিপাইগুলো এসে দাঁড়াল থমকে। আমি ছেলেটাকে বললাম, তুই ওদের গাড়িতে আয়। আমি ঘরের দিকে যাচ্ছি, দেখতে। সেখান থেকেই সরে দাঁড়ালাম

আমি। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই খবর নিয়ে ফিরল সাধন। দারোগা নাকি মুংরার ঘরে ঢুকেই একটা সাঁওতালকে পেয়েছিল ভিতরে। লোকটা সন্দেহজনকভাবে সরে পড়বার চেষ্টা করাতে তা'কে সেখানেই বাঁধা হয়েছে এবং সেই লোকটাকে তালাস করে মুংরার ৩১নম্বর চাক্‌তিটা তা'র পকেটে পাওয়া গেছে। মুংরার ঘরে টাকা পয়সা এবং অন্যান্য দু'একটা দামী জিনিসও ছিল। তা'র কোন কিছুই চুরি যায় নি।

সতীশের মুখের কালো ছায়া সরে গিয়েছিল। এলিয়ে পড়ল সে পিছনের দিকে।

বাসু বলে যাচ্ছিল, সাধন খুব আপত্তি করছিল। তবু সন্ধ্যার গাড়িতে তাকে একরকম জোর করেই তুলে দিলাম।

সতীশ গভীর গলায় বলল, ভালই করেছ বাসুদেব। তোমার বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতার কিছু ঘাটতি যদি থেকেও থাকে, তবু ভগবানের আশীর্বাদ রয়েছে তোমার উপর। কা'জেই শেষ পর্যন্ত ভাগ্য হয়ত আমাদের বিমুখ করবে না। আমি তোমার উপর নিশ্চয়ই নির্ভর করতে পারি।

—তার মানে—তুমি থাকছ না?

—না বাসু। উল্টো দিক থেকে গাড়ি এসে গেল। এইবার ছাড়বে এটা। তুমি নেমে যাও। আমি সাম্নের ষ্টেসনে গিয়ে গাড়ি বদল করে মেলট্রেনে চাপবো—যা'তে তাড়াতাড়ি করতে পারি।

ষ্টেসনে এ-গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা পড়ল।

বাসু প্রশ্ন করল, আমার প্রতি কি আদেশ থাকল ?

—আদেশ নয় বাসু। কাজটার কথাই শুধু বল্‌ছি। ঐ চাক্‌তিটা কোনমতেই পুলিসের হেফাজত থেকে সরলে চলবে না। এটা একনম্বর কায। তারপরে ঐ সাঁওতালটা অনেকখানি জানে। বাড়ুয্যে নিজে এসেছে ফিরে। নানান ভাবে খুবই চেষ্টা করবে ওকে শুধু ছাড়াতে নয়, মুংরার কাছেই পাঠিয়ে দিতেও। ও কোন স্বীকারোক্তি না-দিক্, যা'তে হাজত থেকে ছাড়া না পায় —সেটা দেখতেই হবে। নিজকে একেবারে অদৃশ্য এবং অননুভূত রেখে এ দুটো যদি হাসিল করতে পারো, তবে এই কাজে তোমার কৃতিত্বের কোন তুলনা রইবে না। কি ভাবে কি করবে তা' আমি বলতি পারছি না। —গাড়ি চলতে আরম্ভ করেছে, এবারে নেমে যাও বাসু। নিজকে খামকা বিপন্ন করবে না কক্ষণো। এটাই আমার সবচেয়ে বড় আদেশ। কাজের কথা যা' বললাম তা' করতে পারো ত করবে, নয় শুধু গা-ঢাকা দিয়ে থাকবে। আমি ফিরে এসে যা হয়' করবো।

বাসুর মুখ রক্তোচ্ছ্বাসে ভরে উঠল ; উপরের দাঁতগুলো নীচের পাটিতে গিয়ে বসল শক্ত চাপ ফেলে। প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল অনেকটা দূর। কিছুই-নয় ঠিক এমনভাবে বাসু নেমে গেল। সতীশ হাত নাড়ল দুবার ঃ একটু হাসল।

গাড়ির বেগ বাড়ছিল ক্রমে। বাইরের সিগ্‌নাল পার হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। সতীশ অস্ফুটস্বরে একবার বলে উঠল,

আবার আসব। কামরাটা নির্জন নীরবতায় ভরে গেল ; সতীশ তলিয়ে গেল নিজের মধ্যে।

## পাঁচ

যুক্ত-প্রদেশের মধ্যে নয় কেবল, গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে কানপুর নামকরা বড় সহর। যুদ্ধের আগে সতীশ একবার এসেছিল এখানে। কিন্তু মাত্র ৬।৭ বৎসরের ব্যবধানে কানপুরের হয়েছে অসাধারণ পরিবর্তন ও বৃদ্ধি। বিশেষ করে সব রকম ব্যবসায়ের কেন্দ্র হিসাবে এর বৃদ্ধিটাই সতীশের মনোযোগ আকর্ষণ করল।

"নিউ ন্যাশ্‌নাল্‌ টেক্সটাইলমিলস্‌ লিমিটেড্‌" অবাক করল তা'কে। মাত্র দশ বৎসর আগেও ছিল খোলা শহরতলীর গায়ে এখানে একটা বিস্তীর্ণ পড়ো মাঠ। আজ এখানে মিল বসেছে একটা প্রকাণ্ড ; সারি-সারি শ্রমিকদের ঘরের লাইন চলে গিয়েছে বহুদূর পর্য্যন্ত। মিলের উঁচু চুংগী থেকে অনবরত কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরিয়ে আকাশ-বাতাস ভরে দিচ্ছে। রাত দিন কাজ চল্‌ছে—বিভিন্ন "সিফ্‌টে"। বস্ত্রহীন দেশবাসীর লজ্জা-নিবারণের জন্য মিল-মালিকের বোধ হয় আহার নিদ্রা ছুটে গিয়েছে।

কোন কিছুই তো সস্তা নয় এ-বাজারে। এর মধ্যে মিলের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা, এত বড় ইমারত গড়ে সেগুলি বসানো,

কাঁচা মাল যোগাড় করা, কুলীমজুর ঠিক রাখা—কম কৃতিত্বের বিষয় নয়। তা' ছাড়া আগাগোড়া দেখে এ-কথা স্বীকার করতেই হবে যে "নিউ ন্যাশ্‌নাল্‌" যুদ্ধের সৃষ্টি হলেও খুব আধুনিক, পোক্ত এবং বড় কাপড়-কল হিসাবে গণ্য। কাজেই মিল্‌ মালিক যে সরকার ও দেশ-নেতাদের তরফ থেকে প্রশংসা লাভ করবেন, তা'তে বিস্মিত হবার কিছুই নেই।

মালিক? হ্যাঁ, তা' বলা যায় বই কি। কাগজ পত্রে লালা শ্যামরতন বিশ বছরের জন্য ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (মূল পরিচালক) বলে অভিহিত হলেও এই লিমিটেড্‌ কোম্পানীর সমস্ত ডেফার্ড শেয়ার এবং শতকরা সত্তরটি সাধারণ শেয়ার তিনি বিভিন্ন আত্মীয়স্বজন ও তাঁবেদারদের নামে কিনে রেখেছেন। কাজেই কোন দিনই কেউ তাঁকে বা তাঁ'র বংশধরদের এই যৌথ ব্যবসায়ের সর্বময় কর্তৃপদ বা মালিকানা থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।

শুধু এই কাপড়-কল নয়, আরো অনেকগুলি বড়বড় ব্যবসায়ের তিনি মূল পরিচালক হয়ে বসেছেন। অথচ বিশ বছর আগে সামান্য ঠিকেদার মাত্র ছিলেন লালা শ্যামরতন। এরকম উদ্যোগী ভাগ্যবান এবং স্বয়ংসিদ্ধ লোকের জীবন অন্যদেশ হলে এতদিনে সগৌরবে প্রকাশিত হত।

কতগুলি ব্যাপারে লালাজী যে দেশের বহু শিল্পপতির চেয়েই অনেক বেশী প্রগতিশীল তা' অস্বীকার করবার উপায় নেই। প্রথমতঃ, শুধু সাধারণ মজুর নয়, কেরাণী থেকে

অফিসার পর্য্যন্ত সবাইকেই সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করেন লালাজী। দ্বিতীয়তঃ, লালাজীর সমস্ত মিল বা কারখানাই তিনি করেছেন বিশেষ আধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে এবং বেশ বড়সড় করে—যা'তে উৎপন্ন জিনিসের পড়তা কম হয় এবং ভারতবর্ষের মত মস্তবড় বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে মাল সরবরাহ করা চলে। তৃতীয়তঃ, শিক্ষার মূল্য তিনি জানেন এবং আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্তকে ভাল দাম লালাজী দিচ্চেন। চতুর্থতঃ, প্রচার বিভাগ এবং পত্রিকার মূল্য তিনি বোঝেন। ভারতবর্ষের মধ্যে লালাজীর চেয়ে বড় ব্যবসায়ী হয়ত অনেক আছেন। কিন্তু তাঁ'র ওজনের ব্যবসায়ী তা'র অর্দ্ধেক পয়সাও প্রচার কার্যে খরচ করেন না।* *

চারিদিক দেখে সতীশ বলল, সবই স্বীকার করি। লালাজী যে একজন মস্ত কাজের লোক সে-কথা আমি অস্বীকার করলেই-বা দেশের সর্ব্বসাধারণ মানবে কেন? তারা যদি বা তবু দেখবে, রাজপুরুষেরা খেতাব দিয়ে যা'বে তা'কে। আমার প্রশ্নটি অতি ছোট্ট। ব্যবসা জিনিসটা তো ম্যাজিক্ নয় যদিও ম্যাজিক্‌কে এক রকম ব্যবসা বলে ধরতে পারো। রাতারাতি ঠিকেদার লালাজী এতবড় ব্যবসাদার বনল কি করে?

—চুরি ডাকাতি খুন জোচ্চুরির তদন্ত করে-করে চরিত্রটাকে বেশ সন্দেহপ্রবণ করে ফেলেছ। তার উপর আজ চার দিনের চেষ্টায়ও দেখা করতে পারলে না তুমি। আমার মত সামান্য একজন ডাইং মাষ্টারের বিশেষ সাধ্য যে থাকতে পারে না এ-ব্যাপারে, তা'তো সহজেই বিশ্বাস করতে পারো তুমি!

—লালাজী নিশ্চয়ই খুব ব্যস্ত থাকেন সর্বদা। তা' ছাড়া আজকাল নাকি উনি রাজনীতি ক্ষেত্রে পাঁয়তারা করবার ব্যাপারে ব্যস্ত আছেন। আমি যাই কোথায় বলতো? যেখানেই দেখি মানুষ কিছু কামাই করল, সেখানে এসে জুটল দেশ ও দশের উপকার বা সেবা। যে দেশ-সেবক বলে নাম করেছে, সে দেখা যাচ্ছে রোজ একটা করে ব্যবসা গড়ে তুলবার জন্য চেষ্টিত। আর যে টাকা করেছে বাণিজ্য থেকে—সেই এসে ভোটের বাজার গরম করে দিচ্ছে।

—তুমি-ও লেগে পড় সতীশ। মনে আফ্‌শোষ রেখে লাভ নেই।

—তা' নেই। সেজন্যই খুঁজে বেড়াচ্চি আরব্য উপন্যাসের সেই দৈত্যটাকে।

—তা'কে তো পড়েছি একটা বোতলের মধ্যে পুরে রেখেছিল।

হেসে উঠল ছু'জনেই। বিনয় জুড়ল, সেই দৈত্যটাকে আজ-কাল অনেকেই খুঁজে পেয়েছে কালো বাজারের কল্যাণে··

সতীশ গুম্ হয়ে গেল, লালাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ এ-যাত্রায় হল না, বিনয়! ভবিষ্যতে আসবার আগেই সাক্ষাৎকারের বন্দোবস্ত করে আসব।

—সেটা খুব ভাল হবে, সতীশ! কিন্তু এ-কথা আমি বিশ্বাস করতে পারছি নে যে হঠাৎ এখানে একটা চাকুরীর জন্যই তুই এসেছিলি।

—কেন, মোটা মাইনের ব্যবস্থা হ'লে দোষ কি ?

—দোষ আবার কি ! যতই কেন না বক্তৃতা করিস, বাংগালী চাক্‌রীই বুঝেছে ভাল।

—ভুল বিনয়, সে-ক্ষেত্রেও প্রথমে মাদ্রাজী এবং পরে পাঞ্জাবীদের কাছে আমরা বেদম মার খাচ্চি।

—সেটাও ভাল, এক হিসাবে। চাকুরীর বাজার থেকে বাংগালীদের একেবারে ঝেঁটিয়ে বা'র করে দিলে হয়ত আমরা ব্যবসায়ের দিকে বাধ্য হয়েই মাথা দিতাম !

—মাথা আমাদের আছে বলে খুব চীৎকার ছোটবেলা শুনেছি, বিনয়। আমার সে-অবস্থাও দিন-কয়েক হোলো ভেঙ্গে যাচ্চে। ধরো আমাদের লালাজীর কথাই ! কোন্ বাংগালী সাহস করবে এর সাম্‌নে মাথার বড়াই করতে ? শুধ্ একা নয় ; এমন আরো অনেক দৃষ্টান্ত তোমাকে দেখাতে পারি আমি।

—এই চার পাঁচটা দিন বুঝি খুঁজে বেড়ালে যত দৃষ্টান্ত ? সেই সকালে বেরিয়ে কোথায় তুচ্ছ রেল কেরাণী, টালী কেরাণী থেকে আরম্ভ করে লালা শ্যামরতন পর্যন্ত ছুটোছুটি করে বেড়ালে ?

—শহরটা দেখে নিলাম। বড় জোর আর দু'দিন থেকে চলে যা'ব আমি।

—কানপুর কেমন লাগল, সতীশ ?

—অদ্ভুত। কিছুদিন যাবৎ কি হয়েছে আমার—চোখ বুজে আর খুলে কেবল দেখতে পাই স্তূপাকার কালো। নিউ ন্যাশনাল্

দেখতে এসে চোখে যা' ঠেকল আমার সব চেয়ে বেশী—তা' তোদের ঝক্‌ঝকে তাঁত নয়, একশ কাউণ্টের সূতা নয়, তোর ডিজাইন করা বাহারে শাড়ির পাড় নয়···

—তবে কি ? ঘোড়ার ডিম ?

—কয়লা। লালা শ্যামরতন অদ্ভুত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। আরো বছর দুই কয়লা না-নিলেও মিল্ চলবে ওর অনায়াসে।

—কয়লা হাতে থাকা বর্ত্তমান অনিশ্চয়তার দিনে প্রকাণ্ড বড় ভরসার কথা সতীশ। একদিন এর কারখানা বা মিল্‌গুলি বন্ধ থাকার অর্থ বুঝিস তো ?

—হ্যাঁ। দেশের লোক অন্নবস্ত্রের জন্য তীব্র হাহাকার করে উঠবে।

—ঠাট্টা নয়! ব্যবসায়ী মানুষকে সব দিকই ভাবতে হয় সতীশ।

—কিন্তু ভেবে যাঁ'রা কিনারা করতে পারেন, তাঁ'রাই ধন্য। কয়লার অভাব কা'র না ছিল গত ক' বছর! হাওড়ার কত পাটকল বন্ধ থেকেছে, আমেদাবাদের কাপড়-কল কত দিন অর্ধেক বা সিকি কাজ করেছে। তা'রা কি ভাবে নি ? তা'দের জন্য কি সরকারী বিভাগগুলি কোন চেষ্টা বা তদ্বিরই করে নি ?

বিনয় এ-ভাবে কোন দিনই এসব কথা ভাবে নি। কাজেই সে চুপ করে রইল।

সতীশ বলল, এদের টাকা কি আছে না-আছে ভগবান জানেন। কিন্তু এদের স্ফীতি বা মাসের শেষে একটি করে বিরাট

কোম্পানী সৃষ্টি করবার ধরন দেখে মনে হয়, এরা ব্যবসা করছে না, টাকা করছে। হয় এরা ম্যাজিক জানে, নয় এদের বাড়ির নীচেই রয়েছে অফুরন্ত সোনার খনি, নয়তো এরা যুদ্ধকালীন সরকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নোট্ ছেপে গেছে।

—শক্তি বা ক্ষমতা কি কিছুই নয়?

—এর যে কোন ব্যাপারেই শক্তি বা ভাগ্য দরকার বিনয়। পৃথিবীতে দু'শ বছর আগে থেকে যে-সব জাতি শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করে আর্থিক উন্নতি সাধন করেছে, সে-সব দেশে তুমি দেখতে পাবে, যে-কোম্পানী কাপড়ের ব্যবসা করছে, সে কেবল কাপড় নিয়েই আছে। তা'কে চল্‌তি কথায় লোকে হয়তো বল্‌বে বস্ত্র-সম্রাট বা এম্‌নি কিছু। যে লোহা-ইস্পাত ইত্যাদি নিয়ে আছে সে তা'তেই ডুবে আছে। দিন দিন নানা রকম উন্নতি করছে তা'র কোম্পানী সেই বিশেষ শিল্পেঃ নূতন রকমের লোহার পাত, নূতন রকমের ইস্পাত—লক্ষ রকমের উন্নতি বা নূতন কিছু সৃষ্টি করে সে পৃথিবীতে সাড়া জাগাচ্চে; হয়তো করছে নবযুগের প্রবর্তন। লৌহ ব্যবসায়ী কাপড়ের কল করছে না; যেমন বস্ত্র-সম্রাট করছে না লোহার কারবার। কিন্তু আমাদের দেশে দেখতে পাচ্চি ঠিক তা'র উল্‌টো। একই লোক বা পরিচালক কোম্পানী একই সঙ্গে দুনিয়ার যত রকম ব্যবসা আছে সবই করছে বা করতে চাইছে। উড়োজাহাজ থেকে গোরুর গাড়ি, কাপড়-কাগজ-চিনি থেকে পাট-লোহা-ব্যাংক-বীমা-দালালী এমন কি শেয়ার বাজারের জুয়া, আমদানী-রপ্তানী—কিছু বাদ পড়ছে না। এতে

আমি কি বুঝি জানো বিনয় ? এদের লোভের অন্ত নেই। এদের টাকার গরমে, যে-ক্ষেত্রে এদের কোন যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা নেই সেখানেও এরা ঝাঁপিয়ে পড়ছে এবং তাতে করে টাকার জোর নেই অথচ অন্য সব দিকে যোগ্যতর হয়ে এদের তুলনায় দুর্বল যা'রা তা'রা মার খাচ্চে এবং দু'দিন পরে এদেরই দরজায় এসে পেটের দায়ে চাকরী নিতে বাধ্য হচ্চে। এ-জাতীয় ব্যবসার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এরা দশ-পনের বছরের মধ্যে নিশ্চয় নিজেরাও মা'র খাবে নিদারুণ এবং তা'তে করে' দেশের আর্থিক অগ্রগতিতে বাধা জন্মাবে বিস্তর। কিন্তু ঠিক বর্তমান মুহূর্তে এ-রকম পাগলামো সম্ভব হচ্চে আল্‌গা ফাঁপ্‌তি টাকায়—যা' কামাই করতে এদের পরিশ্রম বা চরিত্র বা জ্ঞানের দরকার হচ্ছে না। যা' এরা দু'হাতে কুড়িয়ে পাচ্ছে, তা শুধু চরিত্রের অভাবে চরিত্রহীনতার ভিতর দিয়ে ; সাহসের পরিবর্তে দুঃসাহসের মধ্য দিয়ে। অথচ দুর্ভাগা দেশ এদেরই দিচ্চে নেতৃত্বের গৌরব ; এরা শুধু পয়সা দিয়েই নয়, আমাদের মাথা কিনে নিচ্চে জৌলুষ দিয়ে, মোহসৃষ্টি করে। একটা সমগ্র জাতির, এতবড় সর্ব্বনাশ আর কিছুতে ভাবতে পারি নে আমি !

সতীশকে তখন তোমাদের দেখা দরকার ছিল। ওর সেই আগুন-ভরা চোখ, স্ফীত নাক, উদ্ভাসিত মুখ তোমাদের যদি আমি দেখাতে পারতাম ! সত্য হোক্, মিথ্যা হোক্ মানুষ' যা সমস্ত অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করে, করে সমস্ত চেতনা দিয়ে অনুভব, তা'র প্রকাশ ঠিক এমন ভাবেই হয়ে থাকে। তুমি যত বড় তার্কিক

কেন হও না, সেখানে তোমার ভাষা হারিয়ে যাবে ; মাথা নিজ থেকেই হবে শ্রদ্ধায় আনত।

সতীশের কথাগুলি বিনয়কে খুব আঘাত করল। তা'র মনে হল যে কলেজের বাইরে এসে পাঁচশ টাকা মাইনের এই ভাল চাকুরীটি পেয়ে তা'র প'কেট ফেঁপে উঠ্‌লেও, মাথাটা হয়ে গেছে ফাঁকা! এমন জড়ত্ব এসে গেছে মনের, যে ভালমন্দের বোধটাও যেন ফেলেছে হারিয়ে। জীবনের, বেঁচে থাক্‌বার লড়াই থেমে যেতেই চিন্তার রাজ্যে নেমে এসেছে কৃষ্ণ-শীতল শান্তির যবনিকা ঃ যেমন করে রূপকথা শেষ হয়, "তারপরে তা'রা সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরসংসার করতে থাকল।" যেন জীবনের সব শেষ হয়ে গেল সেখানে। আর উঠবে না ঈশানে ঝড়ের নিশানরূপী লাল মেঘ ; যেন আসবে না কোন দুঃখ-বেদনা-বাধা-বিপদ ; পৃথিবীতে গোলাপ ফুটবে কণ্টকবিহীন ; ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার সাপ-হীন পুকুরে বিকশিত হ'বে ঢল্‌ঢলে পদ্ম ! তা'র চেয়ে অনেক ভালো প্রতিদিনের বিরোধ ; রাত্রিশেষে আশা-আকাঙ্ক্ষার বন্ধুর পথ ; প্রতি মুহূর্তের কঠোর সংগ্রাম বেঁচে থাকবার জন্য। তা'তে তুমি এ-টা অনুভব-করতে পারো যে বেঁচে আছ তুমি, আর সেই শুধু বেঁচে থাকবার মধ্যেও কত গৌরব ! দুঃখ নিয়ে যে বিলাস করে, দুঃখ দারিদ্র্যকে সবলে দূর করতে চেষ্টা করে না, মনের মধ্যে অর্থের লিপ্সা রেখেও যে বাইরে ঘৃণা দেখায় ধনের বা ধনীর প্রতি—তা'দের দলে নয় সতীশ। কিন্তু শুধু দারিদ্র্যের জন্য লজ্জিত হওয়ার মত দুর্বলতাও নেই তা'র।

দারিদ্র্য দূর করতে গিয়ে যদি মনুষ্যত্ব হারাতে হয়, নষ্ট হয় চরিত্র—তবে দারিদ্র্য ত্যাগ করতেও রাজী নয় সে।

বিনয় প্রশ্ন করল, জীবনের এই সত্য যে অনুভূতির ভিতর পেয়েছে, সে তো খুব বড় মানুষ সতীশ?

—ভুল করছ বিনয়। শুধু বড় নয়, ভালো-ও বটে। সে-ই সুখী।

—কিন্তু এর জন্য কানপুরেই কি আসার দরকার ছিল সতীশ? \

—না। বিশেষ করে কানপুরেই আসবার দরকার নেই এজন্য। সমস্ত দেশই তো ডুবে আছে। যেখানেই যা'বে শুনতে পাবে, দেখতে পাবে জাতিগঠনের নামে, জাতীয় সম্পদ সৃষ্টির নামে এ-অনাচার। আর যা'রা এর প্রতিবাদ করছে—তারা শুধু বোকা বা অকেজো বলে পরিহাসের ও করুণার পাত্রই শুধু সাব্যস্ত হচ্চে না, অনেক ক্ষেত্রেই তা'দের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হচ্চে! তুমি অবাক হ'বে জেনে যে ভারতবর্ষের কয়েকটি হাতে আজ যে টাকা ধরবার স্থান হচ্চে না তা'র একটা মোটা অংশ আসছে বাইরে থেকে—এমন-কি সুদূর মিশর দেশ থেকে। এ-দেশের লোক যখন থাকছে উলঙ্গ বা অর্দ্ধ উলঙ্গ, তখন এদেশের কাপড় বাইরে যাচ্চে।

—বাইরে হয়তো আরো অভাব সতীশ। পৃথিবীটা আগের মত আজকাল আর ছোট নেই!

—সে শুধু মৃত্যুর আর টাকার জন্য! এ-দেশের কাপড়

বাইরে যাচ্চে যেহেতু বাইরে সে-সব যায়গায় টাকা জিনিসটা আরো সস্তা, অর্থাৎ মিল্ মালিকেরা সে সব জায়গা থেকে আরো বেশী পয়সা পাচ্চে। কাপড় পাচ্চে। অথচ বাইরের কাপড় ঢুকছে এখানে। এর কি কোনই মানে তুমি ভেবে দেখ নি ?

—মিল্ মালিকরা হয়ত ইচ্ছে না-থাকলেও রপ্তানীর ব্যাপারে বাধ্য হচ্চে !

—বাজে কথা বিনয়। গলাবাজী করে বলবার কথাই শুধু এটা। আর যদি তা' হয়েই থাকে তবু তা'দেরই আমাদের নেতা বলে, ভাগ্যবিধাতা বলে মেনে নিয়েছি আমরা। আমাদের কেন ডাকছে না তা'দের অসুবিধার বা বিপদের পিছনে গিয়ে দাঁড়াবার জন্য ?

—ভাবরাজ্য ও বাস্তবে কি কোনই তফাৎ নেই বলে মনে করো, সতীশ ? মুখে যত সহজে তুমি কথাটা বলে ফেললে কাজে সেটা ততটা সোজা তো না-ও হতে পারে !

—না হতে পারে কি বলছো, বিনয় ! কাজে করা মুখে বলার চেয়ে চিরকালই অনেক কঠিন। তা' বলে রবীন্দ্রনাথের মত কবিতা লিখতে পারি নে বলে কি রবীন্দ্রকাব্যের সমালোচনাও করতে পারবো না ?

—বেলা হয়ে যাচ্ছে, সতীশ ! প্রায় ন'টা !

—আমিও বেরুব একটু। আর তো দু'দিন মাত্র থাকবো। এর মধ্যে আরো অনেকগুলি কাজ শেষ করতে হবে আমায়।

—কাজ আর কাজ। কী যে করছ তার কিছুই কি

বুঝবার জো আছে নাকি! কী এক বোমার বাতিক চেপেছে মাথায়। ভাল ছাত্র ছিলাম বলে কি এসব বোমা টোমাও বানাতে পারি আমি? সতীশ একটু হাসল। স্নান করবার তাড়া ভিতরে গেল বিনয়। মনে মনে বলল, যতটুকু সাহায্য না জেনেও করেছে বিনয়—তার জন্য বহু ধন্যবাদ পাওনা হয়ে রইল তার!

তপ্ত দিনের ধূলি-ধূসর পথ বেয়ে ষ্টেসনের দিকে চলল সতীশ।

কানপুরের কাজের জন্য যে-ক'টা দিন লাগবে মনে করেছিল, তা'র দু'দিন আগেই সতীশ ফিরল। কিন্তু এই দু'টো দিন হাতে পেয়ে একটু যেন বিব্রতই হল প্রথমটায়। এ-কদিন তা'র একেবারে বিশ্রাম ঘটে নি কখনো! সকাল নটা থেকে রাত ন'টা কাটিয়েছে ঘুরে, ছোটবড় নানান লোকের সঙ্গে দেখা করে। ঘরের দরজা আটকে বসেছে কি-সব লিখতে। ওর ঘরের বাতি নিভেছে রাত বারোটায়—যখন আর কিছুতেই চোখ খুলে রাখতে সক্ষম হয় নি। এখানকার বাইরের কোন কথাই ভাবতে পারে নি; সবই যেন মুছে গিয়েছিল মন থেকে! ওর তদন্তের সব চেয়ে কঠিন ভাগটাই যে এখানে তা' কল্‌কাতা ছাড়বার পর থেকেই বুঝেছিল এবং সেজন্য তৈরী হয়েই এসেছিল।

গাড়ি কানপুর ষ্টেসন্ ছাড়তেই ওর সর্ব্বপ্রথমে মনে পড়ল বাসুর কথা। কোথায় কি ভাবে আছে সে? যে কাজ দু'টির

ভার দিয়ে এসেছে তা'কে তা' যদি হাসিল করতে না পেরে থাকে—তবে তাকে কিভাবে কি করতে হবে, তারই একটা কার্যক্রম মনে-মনে ছকে নিতে চেষ্টা করতে লাগল সে। ওর কামরায় আরো তিন-চার জন যাত্রী। সম্ভবতঃ সবাই নূতন ব্যবসায়ী। কথায় কথায় বড়-বড় যোগ-বিয়োগ করে যাচ্ছিল নিখুঁত—নির্ভুল।

ভাগ্যক্রমে নীচের একটা গদীই পেয়েছিল সে; রাত-ও মাত্র আটটা। কিন্তু স্বেচ্ছায় সে নীচের আসন ছেড়ে দিয়ে একজনের সঙ্গে আপোষ বিনিময় করে চলে গেল উপরের বাংকে। ভোরবেলা একটা বড় ষ্টেসনে গাড়ি থামতেই লাফিয়ে নেমে পড়ল সতীশ। গার্ডকে জানালো যে সে টিকেট্ বাড়িয়ে নেবে ধানবাদ অবধি।

ধানবাদ পৌঁছেই সতীশ সটান চলে গেল বাসুর আস্তানায়। খুব ভাল করে স্নানাহার করে' কয়েক ঘণ্টা না-ঘুমিয়ে সে কোন কাজেই বেরুবেনা বলে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল।

কিন্তু হায়, ভগবান এই লোভনীয় বিশ্রাম থেকে বোধ হয় বঞ্চিত করলেন সতীশকে। বারান্দায় পা দিতেই ছুটে এলো বাসুদেব! রাত জেগে কি ভুল দেখছে সতীশ? পৃথিবীতে আর সবই হতে পারত এবং তাতে সতীশ বিস্মিত হত না—এক আজ এই সময়ে ধানবাদে বাসুর অপ্রত্যাশিত উপস্থিতি ছাড়া।

সতীশ কপালে চোখ তুলে প্রশ্ন করল, তুমি এখানে কেন বাসু?

—কেন, সতীশ দা' ? তুমি চাক্‌রী ছেড়ে দিতে পারো—তোমার টাকা আছে। অমন দিনের পর দিন কাজ কামাই করলে আমার চলবে কি করে ?

—সে তো সত্যি কথা—যা' নাকি বলা উচিত ছিল সুরুতেই। এখন এতবড় দায়িত্ব তুচ্ছ করে চলে আসা শুধু অন্যায় নয়, জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা।

—আমি বিশেষ দুঃখিত যে দুরবস্থায় পড়ে সে'টিই করতে হয়েছে আমায়, মাফ করো !

—কিন্তু অপরাধীর মত মুখ বা কণ্ঠ তোমায় নয় বাসুদেব ! কাজের কি হয়েছে ?—প্রশ্ন করে' সতীশ উৎসুক মুখে চাইল।

—কাজের জন্যই তো এখানে আসা ! তোমার নম্বর পুলিসের হেফাজতেই আছে। সাঁওতালটা স্বীকারোক্তি করবে বলাতে তা'কে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। আমিও সঙ্গে-সঙ্গে এসেছি, ওখানে আর কোন কাজ নেই বলে। তা' ছাড়া নিজকে বাঁচানোর দুর্ভাবনাও তো আছে !

—কিছু বুঝছিলে ?

—উ হুঁ। ভদ্রপুরের মার ভয়ানক ভদ্রভাবে আসে। আগে থাকতে টের পাওয়া মুস্‌কিল।

সতীশ হাসল, বলল, তোমার ঘরে চললাম বাসু ঘুমুতে।

—স্নানাহার ? সাশ্চর্যে প্রশ্ন করল বাসু।

—সে হ'বে তুমি ফিরলে। চাকরটা তো থাকলই। আজ

সন্ধ্যার পরে এখানকার পুলিস্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে হ'বে বাসু।

—স্বীকারোক্তির আগে ওর সঙ্গে মোলাকাতের ব্যবস্থা করবে না?

—সব হ'বে বাসু। আমি আর দাঁড়াতে পার্‌ছি নে। তুমি ঘুরে এসো, সব হবে ধীরে সুস্থে!

## ছয়

অন্ধকার নিশুতি রাত।

ঠাণ্ডা শিরশিরে হাওয়া বইছে।

সন্তর্পণে বাতির সুইচ্ টিপে সমস্ত ঘরখানা পরিষ্কার তীব্র আলোয় ভরে দিল সতীশ! নানা রকম ওষুধ পত্রের গন্ধে ঘরের আবহাওয়া ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। কিন্তু টেবিল চেয়ার রয়েছে পরিচ্ছন্নভাবে সাজানো; টেবিলের উপর একখানা বই, দুই তা' কাগজ এবং কাগজ-কাটা ছুরি একটা। শিশি-বোতল-গুলি ঝক্‌ঝক্ করছে দেয়ালের দিক্‌কার একটা লম্বা তাকে। ডাক্তার সিংহের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় না-থাকলেও একথা বুঝতে পারল যে লোকটার মন অত্যন্ত গুছালো এবং সাফ্ কাজকর্ম ই তা'র পছন্দ।

একটার পর একটা ড্রয়ার টেনে যেতে লাগল সে। কিন্তু কিছুই পাওয়া গেল না। ঘরের কোণে লুকানো বা আড়াল-

করা আলমারীর একেবারে নীচের বা উপরের ড্রয়ারগুলি খোঁজা শেষ হ'ল। কিছু পরিশ্রম এবং কিছু হতাশায় সে বসল এসে টেবিলের পাশে ডাক্তারের উল্টোমুখী চেয়ারে। আগের বারে আনা টিংচারের দু'তিনটে বোতল দেখল ডাক্তারের নিজের কাজ করবার জন্য এই ঘরের কোণের টেবিলের উপর রয়েছে। কাজেই তা'র অভিনব পরীক্ষা সংক্রান্ত কাগজপত্রও নিশ্চয় এঘরেই থাকবে কোথাও। কিন্তু কোথায় রেখেছে গোপন করে, কে জানে। হয়ত টেবিলে বা আলমারীর গায়ে কোন গোপন খোপ-টোপ আছে—সেখানেই রেখেছে ডাক্তার তা'র গোপন আবিষ্কারের ফলাফল লিপিবদ্ধ করে। তা' ছাড়া ঐ লোহার সিন্ধুকেও থাকতে পারে।

কিন্তু এগুলি পরীক্ষা করে দেখতে সময় লাগবে। তা' ছাড়া পরীক্ষা করতে করতে কোন যায়গায় কোন সন্দেহের সৃষ্টি হ'লে ফাইল-টাইল লাগিয়ে টানাটানি করে খুলতে হবে।- তা'তে যে-পরিমাণ শব্দ হবে এঘরে, ডাক্তার নিশ্চয় জেগে উঠবে। ঘরটার আর এক অসুবিধা এখানে যে, এদিক থেকে সবগুলো দরজা আটকানো চলে না এর। বাইরে থেকে যে-দরজাটা তালা-দেওয়া রয়েছে, সেদিকেই নিশ্চয় ডাক্তারের শোবার ঘর।

সতীশ কি ভাবতে-ভাবতে পায়চারী করল খানিকটা। আবার এসে বসল চেয়ারে। চমৎকার ব্লটিং প্যাড্‌টি ডাক্তার সিংহের। যেমন বড়, তেমনি মজবুত। টেবিলটার চেয়েও

হঠাৎ দৃষ্টিতে মনে হয়, বেশী দামী। বৈজ্ঞানিক মানুষ—কত রকমের খেয়াল থাকে এদের !

আর খুঁজে কোন লাভ হবে কি ? এবারে তা'র চলে যাওয়াই কি উচিত নয় ? একবার সে ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল ; কোন ওলট-পালট বা তা'র গোপন নৈশ আবির্ভাবের কোন চিহ্ন রেখে যাচ্ছে কি ?

একটা সন্দেহজনক শব্দ এলো কাণে।

সচকিত হয়ে বসল সতীশ। তালা খুলে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছে ডাক্তার সিংহ ! একটা প্রসন্ন হাস্যে সতীশের মুখ ভরে গেল ; চেয়ার ছেড়ে উঠে অভ্যর্থনা করল ডাক্তারকে।—আসুন ! এ-ভাবে আপনার ঘরে ঢুকবার জন্য ক্ষমা চাইবার সুযোগ পাওয়াতে ধন্য হলাম !

ডাক্তার ধীরে ধীরে এগিয়ে এল ; তার দৃষ্টি সতীশের হাতের নীচেকার ব্লটিং প্যাডের অংশের দিকে তীক্ষ্ণভাবে পড়েই চলে এলো ওর মুখ-চোখের উপর। একটা দামী কিমোনো জড়ানো গায়ে, তীব্র আলোতে পোষাকের রং জ্বল্‌ছে যেন থেকে-থেকে।

সতীশ বলল, বসুন। আপনার সঙ্গে কথা আছে। বুঝতে পারছি যে আলাপের এই সময় বা রীতিটাকে সহজ ভাবে নিতে আপনার বাধবে। কিন্তু···

—আপনার পরিচয় সম্পূর্ণ না-জানলেও আপনার সম্বন্ধে আমি অনেকখানি জানি। কিন্তু এই অসম্ভব এবং উদ্ভট প্রচেষ্টার অর্থটা জানতে পারি কি ?

—মাফ করবেন, ডাঃ সিংহ! আপনি আমার কি পরিচয় পেয়েছেন আমি জানি নে। তবে আপাততঃ আপনার অধীনে থেকে বিজ্ঞান-চর্চা করবার অভিপ্রায় নিয়েই আমি কানপুরের সেই কাপড়-কলের চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে এসেছি। আপনি চমকাচ্ছেন? কিন্তু তার জন্য আমি ততটা দায়ী নই, যতটা ম্যানেজার তথা মালিক মিঃ পি. কে. ব্যানার্জি।

—কি রকম?

—আমি প্রায় দশ দিন আগেই মিঃ ব্যানার্জিকে আমার এই ইচ্ছার কথা জানিয়ে আপনার কাছে আমার কেস্ সুপারিশ করতে বলেছিলাম। আপনি যেমন বৈজ্ঞানিক বা মৌলিক গবেষণাকারী হিসাবে ডাক্তারের চেয়ে বড়, আমিও তেমনি জীবনধারণের জন্য বাজে চাকরী করলেও রসায়নের পূজারী। তবে কি জানেন—জাতে বাংগালী অর্থাৎ শ্রমবিমুখ।

—কিন্তু আপনি বুঝতে পারছেন কি যে আপনি আমার ঘরে চুরি করে ঢুকেছেন এবং আপনার বাজে কথা বা রসিকতাগুলি আমি ঠিক বরদাস্ত করতে পারব না?

—হঁ্যা। কিন্তু গোলমাল বা ধরিয়ে দেবার চেষ্টা নিশ্চয়ই করবেন না? ভদ্রলোকের ছেলের ইজ্জত্ নষ্ট করে আপনার এমন কি লাভ হ'বে বলুন?

—তা' যাই হোক্, আপনার এভাবে এখানে ঢুকবার কারণ জানতে পারি কি? আপনি বরঞ্চ পাশের ঘরে ঢুকলে মূল্যবান জিনিষপত্র পেতেন অনেক; নিয়ে সট্‌কে পড়লে আখেরে কাজ দিত!

—আপনি কি বলতে চান যে আপনার এই পরীক্ষাগারে সোনারূপার চেয়ে অনেক মূল্যবান কিছু নেই ?

—কতগুলি শিশি-বোতল, বিশ্রী গন্ধী ওষুধপত্র দিয়ে কি হবে ?

—কিন্তু যদি বলি যে ওতেই প্রয়োজন আমার ? কা'র কিসে প্রয়োজন, ঠিক করে বলা যায় না, ডাক্তার সিংহ! নইলে আমার মত নিরীহ নির্বিরোধী মানুষকে সে সন্ধ্যায় আপনি গাড়ি চাপা দেওয়ার চেষ্টা করতেন না। আমার জীবনে আপনার কি দরকার ছিল, বলুন ?

—বাজে বকছেন আপনি। বিপজ্জনক পথে সাবধান হয়ে না-চললে অনেক মোটরের নীচেই ঢুকে যেতে পারেন।

—কিন্তু সাবধানতা যথেষ্টই অবলম্বন করতে হয়েছে। নইলে আজ দেখা হ'ত কি ?

—আর হয়ত দেখা না-হতেও পারে ? সিংহের গুহার মতই বৈজ্ঞানিকের গবেষণাগার। চোখের নিমেষে এমন কিছু ঘটে যেতে পারে···

সতীশ পকেটে হাত ঢুকিয়ে অত্যন্ত সুস্থিরভাবে পিস্তলটা বা'র করল। কিন্তু অবাক হয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য লক্ষ্য করল যে ডাক্তার চকিতে ব্লটিং প্যাডের এদিকটা একবার দেখে নিয়ে পরে পিস্তলটার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। একটু কি ভেবে নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে ডাক্তার টেবিলের অপর পাশের চেয়ারে বসল। শান্তকণ্ঠে সতীশ বলল, আপনার দুঃসাহস, অদ্ভুত। কিন্তু আপনি আমাকে মোটেই ভয় দেখাতে চেষ্টা করবেন না।

ঐ চেয়ার ছেড়ে উঠতে চেষ্টা করলে আমি গুলি করবো—কথাটা নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করবেন।

ডাক্তার সিংহ একটু হাসল। পরে শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, আমার বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগটা কি ?

—আপনি নিজেই বেশী জানেন আমার চেয়ে, বলুন না ?

—আমি ছেলেমানুষ নই !

—না। তা'র চেয়েও অনেক ছোট। বৈজ্ঞানিক হয়ে, এত বড় একটা অদ্ভুত আবিষ্কার করে আপনি সেটা পৃথিবীর কাছে প্রকাশ করলেন না ? ষড়যন্ত্র আর নরহত্যার কাজে লাগলেন ?

—আপনি কোন পাগ্‌লা গারদ থেকে সন্ধ্যার পরে পালিয়ে এসেছেন বলে মনে হচ্ছে···

—বোধ হয় টিকেটের বদলে এই পিস্তলটাই দয়া করে গারদের রক্ষক দিয়ে দিয়েছে আমায় ! ···বাজে কথা আমিও বলতে চাইনে ডাক্তার সিংহ ! দয়া করে' আপনার গবেষণার কাগজপত্রগুলি দিয়ে দিন, আমি এক্ষুনি বিদেয় হচ্ছি। সারা দিনের পরিশ্রমের পরে আমাদের দুজনারই বিশ্রাম দরকার।

—আপনি কি বলছেন, তা' নিজে জানেন তো ?

—জানি বই কি ! সেই অদ্ভুত বোমার ফর্মুলা এবং অন্যান্য পরীক্ষার ফলাফল যেখানে লেখা—সে-সব কাগজ আমার দরকার। চ্যাটারর্টন্ কোম্পানী থেকে আমি বাকীটা সব জেনেছি। ফর্মুলাটাই দরকার এখন। দিন্ !

—অনেকখানি আপনি জেনেছেন, স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি।

এখানেই থেমে গেলেন, ডাঃ সিংহ? আপনার অনুমানের চেয়ে-ও অনেক বেশী জানি আমি!

যতই জানুন না কেন, এর এক বিন্দু-ও প্রমাণ করবার সাধ্য নেই আপনার। পৃথিবীতে এ খবর যে-জানত, সে অতিরিক্ত মদ খেয়ে মারা গিয়েছে আজ দশ দিন।

—শুধু কি মদ, ডাঃ সিংহ? তা'র সঙ্গে বিষ মিশিয়ে দে'য়া হয়েছিল। চমকে উঠবেন না। আমি অনেকখানি জানি! ··· কথা বলছেন না যে?

—না। ভাবছি, আমার তালিকায় আপনার নামটাও যোগ করব কি না। তবে তা'তে আমার এই সাধনার ক্ষেত্রও চুরমার হয়ে যা'বে; হয়ত আমিও মরব। আমার নূতন ফর্মুলাটার চমৎকার একটা পরীক্ষা হয়ে যেতে পারে এখন, এই মুহূর্তে। কিন্তু তা'র ফলাফল লিপিবদ্ধ করে রাখবে কে?

শিউরে উঠল সতীশ। কিন্তু কঠোর কণ্ঠে জবাব দিল, নাই-বা থাকল বীভৎস একটা আবিষ্কারের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়ে। মানুষের মগজ, বিজ্ঞানের সাধনা তো কিছু কম কলঙ্কিত করে নি পৃথিবীর ইতিহাস! আর বিড়ম্বনা কেন বলুন?

—কারণ শুধু আপনি। বুঝতে পারছেন না আপনাকে আমি কতটা ঘৃণা করছি!

—সাবধান ডাঃ সিংহ! টেবিলের পাশটা ছেড়ে দিন। ওটা হঠাৎ ঠেলে দিতে চেষ্টা করবেন না।

ডাঃ সিংহ চোখের নিমেষে বস্‌বার চেয়ারটা উল্টে দিয়ে মাথা নীচু করে অদৃশ্য হয়ে গেল, সঙ্গে-সঙ্গে কাগজ-কাটা ভোঁতা চাকুটাও। সতীশ ওর পায়ে অনুভব করল একটা তীব্র ব্যথা। কিন্তু অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গেই সে-ও নিজকে ছুড়ে ফেলে দিলে মেঝের উপর; সঙ্গে সঙ্গে বা' হাতে গুলি করল। মনে হ'ল লেগেছে ডাঃ সিংহের গায়ে। কোন রকম যন্ত্রণার শব্দ বা নড়াচড়ার আভাস লক্ষ্য করা গেল না। টেবিলের নীচেটা অন্ধকার; ডাক্তার কেমন জড়িয়ে পড়ে আছে দেহটাকে। সতীশ দেখল, ওর হাঁটুর নীচ থেকে রক্ত পড়ছে মেঝের উপর। কোন যন্ত্রণা বা অসাড় লাগছে না যদিও, তবু চিন্তিত হল। কিন্তু সে'দিকে দেখবার খুব বেশী সুযোগ সে পেল না। ডাক্তারের নিশ্চল দেহটার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেই হবে। কোথায় গুলিটা লেগেছে—তা'ই বুঝতে পারছে না···মরে গেল কি?

পাশের ঘরে দু'তিনজন লোকের অস্তিত্ব বেশ স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে সতীশ। ওর চাকর-বেয়ারাই হবে বোধ হয়। অবিবাহিত, নির্বান্ধব ডাক্তারের সংসার ওদের নিয়েই।

সতীশ উদ্দেশে বলল, এ-ঘরে যে-কেউ ঢুকতে চেষ্টা করবে, তা'কেই কুকুরের মত গুলী করে' মারব আমি। ···পদশব্দ স্তব্ধ হল।

কিন্তু তবু যেখানটায় পড়ে গিয়েছিল সে, সেখানে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। যে-কোন সাহসী বা বুদ্ধিমান লোক নিজকে সম্পূর্ণ আড়াল ও অক্ষত রেখে তা'কে ঐ ঘর থেকে

ঘায়েল করতে পারে। ডাক্তারের দিকে পিস্তলের টিপ্ রক্ষা করে সে নিজকে ছেঁচ্ড়ে ছেঁচ্ড়ে সরিয়ে নিতে লাগল ঘরের কোণায়—যা'তে দরজা দিয়ে নূতন আততায়ী ঢুকলেও সে ঠিকমত গুলী করতে পারে অথবা ডাক্তারও যদি বেঁচে থাকে তো সরে আসলে না যেতে পারে।

মিনিট্ তিন চারের মধ্যেই পছন্দসই একটা অবস্থান পেল সতীশ। এবারে ওর ইস্পাতের মত কঠিন কণ্ঠ তীক্ষ্ণভাবে বেজে উঠল নিস্তব্ধ আলোকিত ঘরটার মধ্যে, ডাঃ সিংহ!

কোন সাড়া নেই।

সতীশ বলল, হয় আপনি অক্ষত আছেন, নয় জখম হয়েছেন, নয় তো মরে গিয়েছেন। আপনার নিশ্চল দেহ আমার পিস্তলের সঙ্গে রয়েছে; খুব কাঁচা হাত হ'লেও চলতে পারে। আপনি ও-রকম ভাবে পড়ে থেকে একটা বিলম্বিত বোমার মতই কাজ করতে চাইছেন। যে-কোন মুহূর্তে আপনি সরে গিয়ে টেবিলটার আশ্রয়ের সুযোগে আবার কোন একটা কাণ্ড করে বসতে পারেন এবং সে-জন্য আপনার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে আমাকে। ওদিকে পাশের ঘর থেকে, এমন কি বাইরে থেকে আমার বিপদ আসতে পারে। অন্য কারণ থাক্ আর না-থাক্ আমার নিজের জীবনের জন্যও আমাকে বাধ্য হয়ে গুলী করতে হবে। যদি সম্ভব হয় তো কথা বলুন! আমি আর দশ সেকেণ্ড অপেক্ষা করেই গুলী করব। যদি বেঁচে থেকে থাকেন তবে অনেকগুলি কথা বল্‌বার ছিল; আলোচনা হতে পারত।

আপনি জানবেন নিঃসন্দেহে যে আপনাকে খুন করেছি বলে স্বীকার করলেও আমার মুক্তি পেতে আটকাবে না। আজ সন্ধ্যায়ই রেল্ ষ্টেসনে এসে পৌঁচেছে "চ্যাটারটন্ কোম্পানী" থেকে চিহ্নিত বাক্সে প্রচুর পরিমাণে আপনার "টিংচার"। সেটা এক নম্বর প্রমাণ্। এর চেয়েও বড় প্রমাণ আপনার নিজের হাতে লেখা বোমার ফর্মুলা আমি সংগ্রহ করেছি। বিশ্বাস-না হয় পরীক্ষা করে দেখতে পারেন, আমি বলে' দিতে পারি কিনা এই ঘরের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন···কথা বলুন, বলুন্ ডাঃ সিংহ···এক্ষুনি···এক সেকেণ্ডের মধ্যে···

টেবিলের নীচে ডাক্তারের শরীরটা নড়ে উঠল। যেন কবর থেকে আওয়াজ বেরুল, পিস্তলটা নামিয়ে রাখুন···একটু আলাপ করা যা'ক্।

—পিস্তল নামানো অসম্ভব। তবু সোজা হয়ে উঠে বসুন আপনি, গুলী করবো না।

অসম্ভব। প্রথম গুলীটা বাঁ' উরুতে লেগেছে; কোমরটা ধরে গেছে।

—আশ্চর্য! এতটুকু শব্দ করেন নি আপনি!

—দুঃখ আর কিছু নয়। পিস্তলের মত একটা আদিম এবং ঘৃণ্য হাতিয়ার কাবু করে ফেলেছে আমাকে।

—বেশী বড়াই করবেন না। আমাকে আপনি আরো আদিম একটা কিছু দিয়ে জখম করেছেন, ডাক্তার সিংহ!

হেসে উঠল ডাক্তার—কিন্তু অকস্মাৎ একটা যন্ত্রণাসূচক

"উঃ" করে থেমে গেল। পরে বলল কষ্টে দম্ টেনে, একটা প্রস্তাব করছি। ভাল ভাবে শুনুন। আপনার পিস্তলের নল আমার দিকেই ধরে রাখুন ; আমি টেবিলের নীচে থেকে সাম্নের দিকে সরে আসছি এগিয়ে। এসে আলোতে মুখোমুখী বসতে চেষ্টা করছি। তা'তে আমার পক্ষে অতর্কিতে কিছু করা সম্ভব হবে না সহজে।

সতীশ হঠাৎ কোন মন্তব্য করতে পারল না।

ডাক্তার আবার বলল, আপনি রাজী না-হলে রক্তক্ষয় হয়েই মরে যা'ব আমি! গুলিটা বেশ লেগেছে। রক্ত বন্ধ হচ্ছে না। আপনার তো দেখ্ছি চাকা বেঁধে রক্ত পড়াটা থেমেছে!

সতীশ যেন চাবুকের ঘা খেল একটা। তাড়াতাড়ি বলল, আপনার প্রস্তাবে রাজী হলাম ডাক্তার। এগিয়ে আসুন।

ঘন লম্বা শ্বাস টানতে টানতে ডাক্তার দেহটাকে টেনে নিয়ে এল বাইরে। পিছনে রক্তের ধারা। আলোতে মুখ বা'র করতেই সতীশ দেখল, এই নিদারুণ শীতেও ডাক্তারের মুখ বড়-বড় ঘামের ফোঁটায় ভরে গিয়েছে।

বেরিয়ে এসে টেবিলে হেলান দিয়ে বসে ডাক্তার বলল, পিস্তলটা মোটেই নামান নি দেখ্ছি। সাবাস! আরো একটা কথা বলছি, শুনুন। আপনার ঠিক পিছনের টেবিলে মাথার বা' দিকে গাঢ় নীল রংয়ের যে শিশিটা আছে, ওটার ভিতরে যে-ওষুধ আছে, সেটা আমার মৌলিক আবিষ্কার। ওটা ব্যবহার করা আপনার-ও দরকার এখন। আমার তো ভীষণ প্রয়োজন।

বিশ্বাস না হয় আমাকেই এগিয়ে দিন্ শিশিটা। মাথা না ঘুরিয়ে শুধু বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিন্—দুটো শিশি হাতে নাগাল পাবেন। এখান থেকে বলে দিচ্ছি আমি।

পাথরের মত বসে রইল সতীশ।

—এখনো সন্দেহ করছেন আপনি। ওটা বিস্ফোরক নয়, বিষবাষ্প নয়। খেলে মৃত্যু হবে অবশ্যি। কিন্তু ও-দিয়ে পৃথিবীর হবে অশেষ কল্যাণ। যে-কোন কাটা যায়গার রক্ত বন্ধ করতে, বীজাণু মারতে এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন সেল্ গড়তে এর মত ওষুধ পৃথিবীতে কেউ তৈরি করতে পারে নি। আমার দৃঢ় ধারণা যে, এটাকে আর একটু অদল বদল করে ইনজেকসন্ হিসাবে ব্যবহার করা যা'বে। তা'তে ক্ষয় এবং ক্যান্সার রোগ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সারবে। দিন্ শিশিটা!

—ওষুধটার কথা বলতে-বলতে আপনার মুখের ভাব যে-রকম বদলেছে তা'তে আপনাকে অবিশ্বাস করা কঠিন, ডাক্তার! কিন্তু আপনার যে পরিচয় আজ পেয়েছি—তা'র পরে এ-অনুরোধ না রাখলে আমাকে খুব দোষ দে'য়া চলে কি?

—না, ডাক্তার একেবারে কঠিনভাবে নিজকে নির্বাক করে ফেলল।

ঘরের মধ্যে নেমে এল আবার উজ্জ্বল আলোকিত নিঃশব্দতা। —দুপুর বেলাকার নিস্তব্ধতার মত; উঁচু পর্ব্বতের উপরের মেঘ-ভাঙ্গা রৌদ্রময় নীরবতার মত; অন্তহীন মরুভূমির মত প্রত্যাশাময়, আকাশের মত অস্ফুট ভাষাময়। একটা ঘড়িও

নেই ঘরের মধ্যে যে টিক্-টিক্ করে সতীশের উত্তেজিত, উদ্বিগ্ন মনের চিন্তাধারার উপর দাড়ি-কমা-কলোন্ বসিয়ে যা'বে।

ডাক্তার সিংহ বল্‌লেন, আরো একটা গুলি করুন আপনি।

—মরতে ভয় পান না আপনি? কথা বলতে পেয়ে বেঁচে গেল সতীশ, তা' হোক্ না কেন যতই নিষ্ঠুর বা বীভৎস।

—জানি নে। তবে ভয়ানক যন্ত্রণা হ'চ্ছে: আর পিপাসায় শুকিয়ে যাচ্ছে সমস্ত অন্তরটা।

—কিন্তু প্রকাশ কই তা'র?

—প্রকাশ পায় তো শুধু ছোটখাট ব্যথা। আপনার ওটা খুব শক্তিশালী পিস্তল! হাড়টা বোধ হয় ভেঙ্গে গেছে। নিজের আত্মরক্ষার জন্য আরো হাল্‌কা এবং ছোট জি-নি-স ব্যাভার করবেন ভবিষ্যতে।

—চুপ করুন! —দেখুন, কোন্ শিশিটা আপনার! বিশ্বাস আপনাকে করতে পারবো না। তবে অপমানিত হওয়ার চেয়ে আপনাকে বিশ্বাস করাই সহজ বলে মনে হচ্ছে আমার। —দেখুন···এটা···থাক্। চোখ জ্বলে উঠ্‌ছে আপনার। —নিন্।

সতীশ ইচ্ছে করেই একটু আবশ্যকের চেয়ে জোরে ছুঁড়ে গড়িয়ে দিল শিশিটা ডাক্তারের দিকে। ডাক্তার কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে ছিপি খুলে···মহা ব্যস্ততার সঙ্গে খানিকটা ঢালল ওর আহত যায়গাটার উপর।

ওর মুখ দিয়ে বেরুল, আঃ। ওষুধটা যদি-ও আমার, তবু

প্রাণ দিলেন আজ আপনি আমাকে। আপনি লাগাবেন কি একটু ? দেখলেন তো আমি নিজেও ব্যবহার করলাম ! ···এই—এই দেখুন, রক্ত থেমে এরই মধ্যে দানা বেধে উঠ্ছে। আর ভয় নেই আমার। দু'মিনিটের মধ্যে দেখতে পাবেন···মিশ্মিশে কালো হয়ে যা'বে যায়গাটা···দেখুন···লক্ষ্য করে দেখুন। আমার একটা মাত্র অনুরোধ—এ-শিশিটাকে রক্ষা করবেন। আমার শোবার ঘরে চিঠি লিখবার টেবিলের উপর এর ফর্মুলা আছে। কথা বলতে এখনো কষ্ট হচ্ছে···গলা শুকিয়ে খর্খরে হয়ে যাওয়াতে।

—আশা করি, জল চাইবেন না এখন আবার ?

—না। জল নেই আপনার নাগালের মধ্যে। আমাকে এ-অবস্থায় ফেলে জল আনবার কথা বলা যায় না আপনাকে। আপনার সাহস ও উদারতা আমাকে বিস্মিত করেছে। ঐ ম্যানেজারের বদলে আপনাকে পেলে পৃথিবী জয় করতে পারতাম আমি। ওরই জন্য আমার সাধনাকে কলঙ্কিত করতে হয়েছে। মরতে আমি ভয় পাইনে। আমি পিছনে রেখে যা'ব না কোন সন্ততি, কোন দায়—যা' আমার বিবেককে ক্ষুব্ধ করে তুলবে। আমার নিজের কলঙ্কের পাশে থাকবে এই ওষুধটার ফর্মুলা। এই কল্যাণকর প্রলেপে আমার অশান্ত আত্মা শান্তি পাবে ; ধুয়ে-মুছে যা'বে সব অপযশ।

—কিন্তু এ-তো শুধু বক্তৃতা, ডাক্তার সিংহ !

—না। এ'টা আমার অন্তরের কথা।

—তা'ই হত যদি, তবে বোমার ফর্ম্‌লাটা কোথায় রেখেছেন তা'ও বলে ফেলতেন আপনি। এ-বাড়ির মধ্যেই যে আছে, তা'তো সত্যি কথা। খামোকা দেওয়াল খুঁড়ে বাক্স-আলমারী ভেঙ্গে তচ্‌নচ্‌ করতে বাধ্য করাবেন আপনি। ওটা আমার খুঁজে পেতেই হবে।

—রক্তটা বন্ধ হওয়াতে, তৃষ্ণা কমে এসেছে। অদ্ভুত শক্তি ওষুধটার। ব্যথাও কমে এসেছে। আবার গুলী করবেন না, কথা সহজ হয়ে আসছে দেখে।

—ভয় নেই।

—ভয়? কিসের ভয় দেখাচ্ছেন আপনি? সংসারের আইন, ধর্ম, বিবেক, ভগবান—কাউকে ভয় করে না ডাক্তার সিংহ। কিন্তু আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে একটু আগেই আপনি চ্যালেঞ্জ করছিলেন যে ফর্ম্‌লা কোথায় আছে, তা' বলে দিতে পারেন; বলেছিলেন পরীক্ষা করতে আমাকে; যা'ই বলেন না কেন এখন। আমার সাড়া না-পেলে আপনি অবশ্যই গুলী করতেন এবং তা' হ'লে এই ওষুধটার কথা বলা হ'ত না আমার। শুধু এর তাগিদেই কথা বলেছিলাম; ভয়ে নয়।

—পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আমি ডাক্তার। বোমার ফর্ম্‌লা আপনি এমন একটা প্রকাশ্য স্থানে লুকিয়েছেন যে আলমারী ভেঙ্গে, সিন্দুক খুলে, দেওয়াল গুড়ো করে তা' পাওয়া যা'বে না। তবু, আপনার মুখ থেকেই কি বলা উচিত হ'ত না কথাটা?

—না। শুধু এজন্য যে তা'তে ম্যানেজারকে বিপন্ন করা হবে। আমি জানি সে জঘন্যতম শাস্তিরই যোগ্য। তবু আমি আপনাকে কিছুতেই সাহায্য করতে পারি নে।

—আপনি ভাবছেন বাড়ুয্যের বিরুদ্ধে কোনই প্রমাণ আমি সংগ্রহ করতে পারি নি! ভুল করছেন, ডাক্তার। যুদ্ধ এলো ঃ পৃথিবীর চরম দুর্ভাগ্যের মত আক্রমণ করলো দেশের মূক দরিদ্রদের। শুধু প্রাণ নয়; দেশের চরিত্র পর্যন্ত হল আক্রান্ত। মানুষ ক্ষুধার জ্বালায় কি কুকাজ করেনি, বলতে পারেন? ভদ্রপুর কলিয়ারির মালিক সমীর দত্তের যত গুণই থাক—কল্পনা বলে একটা বস্তু তাকে তা'র সৃষ্টিকর্তা দেন নি। এই যুদ্ধের সময়টাতে অতবড় এবং ভালো একটা কয়লার খনি থেকে যে তাল-তাল সোনা তোলা যায়, তা' মাথায় এলো না তা'র। তার কঠোর ব্যবস্থা ও শাসনে অন্যান্য খনি যখন বন্ধ করল কাজ—তখনো ভদ্রপুরে কাজ চললো পূরোদমে। কিন্তু বাঁধা দরের চেয়ে একটি পাই-ও সে বেশী নেবার কথা ভাবতে পারল না; অপর দশজনের মত যুদ্ধ-পূর্ব চুক্তি সে ভাঙ্ল না। অবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনের দোহাই দিয়ে রেল্ সরকারের কাছে সে রেহাই চাইল না। আত্মাভিমানী সমীর দত্ত সরকারের দরবারে-ও সাহায্যের জন্য পাঠলো না একখানা দরখাস্ত। অথচ আশ্চর্যের বিষয় গত ১৯৪৩ সালের প্রথম থেকে রাতের অন্ধকারে অগুন্‌তি কয়লা বোঝাই রেলের গাড়িই ধানবাদে না-পৌঁছে কেমন করে চলে গেল সুদূর কানপুরে, লালা

শ্যামরতনের কাপড়ের কলের জন্য! এখানকার হিসাব—অর্থাৎ চালান ধানবাদের চালানের সঙ্গে ঠিক মিল আছে। শুধু চালান নয়। মোট যে-পরিমাণ কয়লা খাত থেকে উঠেছে বলে দেখা যাবে—ঠিক তাই পৌঁচেছে ধানবাদে। একহাজার মজুরের এবং শ' খানেক অফিসার-কেরাণীর আড়াই বছরের কয়লা কোথা থেকে এলো বা উঠল, সে-প্রশ্ন আমি করবো না। কিন্তু লালা শ্যামরতনের হাতে আজও ওজন করলে যে-পরিমাণ কয়লা পাওয়া যাবে, সরকারী লাইসেন্সে গোটা বছরেও তা' পাবার অধিকারী সে নয়।...অদ্ভুত মানুষ আপনি ডাক্তার! আমার কথাগুলি ঘটনা বা সত্যের সঙ্গে বর্ণে-বর্ণে মিল্‌ছে দেখেও আপনার মুখচোখে এতটুকু আভাস ফুটছে না তা'র! —কিন্তু যাক্ সে-কথা। আমি যা নিশ্চিত বলে জানতে পেরেছি, তা' বলে যাচ্ছি। এখন আপনি সব জানতে পেলেও আমার বিপদের কোন আশঙ্কা নেই। আমি প্রমাণ করবো যে ম্যানেজার এবং আপনার সাহায্যে মোটা মানে নিয়ন্ত্রিত মূল্যের প্রায় চারগুণ অতিরিক্ত দাম দিয়ে ভদ্রপুর থেকে লালা শ্যামরতন অদ্ভুতভাবে কয়েক হাজার মণ কয়লা কানপুর অবধি নিয়ে গেছে। রেলের কাগজে-পত্রে কোথাও এর সন্ধান সহজে পাবেন না। কিন্তু যতখানা গাড়ি দিন-মাস-বছরে কয়লা টানবার জন্য এ-ষ্টেসনে কর্তৃপক্ষ দিয়েছে, তা'র অর্ধেক-ও ধানবাদ পৌঁছেনি। সেগুলি গেছে কানপুর। সেখানকার গাড়ির হিসাবে এটা প্রমাণ হবে। শুধু তা'ই নয়। লালা

শ্যামরতন যে-ক'হাজার টাকা কয়লার গাড়ীর জন্য ভাড়া দিয়েছে আড়াই বছর, তা'ও সৌভাগ্যক্রমে জমা হয়েছে রেলের খাতায়ঃ অবশ্যি শ্যামরতনের নামে নয়। সাত্যকি চাটুয্যে করে একজন লোকের নামে এ-সব গিয়েছে কানপুর। ম্যানেজারের বহুদূর সম্পর্কের ভাই ভিন্ন কয়লার সঙ্গে সাত্যকির চৌদ্দপুরুষে কোনকালে ঘনিষ্ঠতা নেই! শুধু বাড়ুয্যে আর লালা শ্যামরতনের জোরই নয়—কাগজে-পত্রে একটা সামরিক ঠিকেদারী-ও রয়েছে তা'র। কিন্তু ম্যানেজারের অবর্তমানে সাত্যকির কোন জোর থাকবে না। একথাও বলতে পারি যে, লালা শ্যামরতন একেবারে প্রথমতম সুযোগেই হাত ধুয়ে সরে যেতে চেষ্টা করবে। টাকা বলুন, বুদ্ধি বলুন, সহায়-মুরুব্বি বলুন, কিছুরই অভাব লালা শ্যামরতনের ঘটবে না। তবু পৃথিবীর সবাই যদি তা'র পিছনে গিয়ে দাঁড়ায়, তা'কে আমি ছাড়বো না। আজ না-পারি তো কাল; এ-ব্যাপারে না পারি তো অন্য কোন অপরাধের দায়ে তা'কে আমি ধরবো।

সতীশ থেমে পড়ল। শুনতে-শুনতে কি ঝিমিয়ে পড়ছে ডাক্তার? না, তীব্র যন্ত্রণার উপশমে, বহু রক্ত ক্ষয়ের পরেকার দুর্বলতার জন্য ক্লান্ত নিদ্রা নেমে আসছে ওর চোখে?

ইতি-কর্তব্য স্থির করবার আগেই মৃদুকণ্ঠে তাগিদ এল ডাক্তারের দিক থেকে।—এ তো শুধু একটা পটভূমি আঁকলেন আপনি অত্যন্ত জলো রং দিয়ে! বিশেষ কোন কাজেই লাগাতে পারবেন না এ'কে।

—আপনার কথা আংশিকভাবে মানবো আমি। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, সমীর দত্তের মনে সন্দেহের দুর্যোগ ঘনিয়ে আস্‌ছে এবং অল্প দিনের মধ্যে সরকারী কর্মচারীদের নিয়ে সে একটা তদন্ত করবেই অমনি সাব্যস্ত করা হ'লো তাকে সরিয়ে দিতে হ'বে। রেল কর্তৃপক্ষের অনুযোগের জবাবে সমীরবাবু যে-কড়া চিঠি লিখেছিলেন অনেককে জড়িয়ে পদস্থ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে সোজাসুজি দোষারোপ করে'—তা' আমি দেখেছি। আদর্শবাদী মানুষ তা'র যতই প্রশংসা করুক না কেন, তা'তে তার বুদ্ধির বা ব্যবসায়ী মনের কোন সাক্ষ্য নেই। এ সিদ্ধান্তের কথায় লালা শ্যামরতন ছিল সবচেয়ে উৎসাহী; সে খবর পাঠালো যে সে পিছনে আছে। দশ লাগে, বিশ লাগে—দেবে সে। সে-খবর বহন করে এনেছিল তা'র ম্যানেজার। ভাগ্য-বিধাতা নিজেই তখন বিপক্ষে সমীরবাবুর। ভদ্রলোক নিজেই আপনাদের সুযোগ সৃষ্টি করে দিলেন নিজের মৃত্যুর। তবু হত্যাকারীদের এতটা সাহস হ'ত না—যদি আপনি না-থাকতেন এর পিছনে। আপনার অভূতপূর্ব মারণাস্ত্রের শুধু প্রাথমিক পরীক্ষা হিসাবেই যে উৎসাহ ছিল আপনার, তা' সত্যি নয়। সমীর প্রকাশ্যে অপমান করেছিলেন আপনার। খনির যে দিক্‌টা মিথ্যা প্রচারের ফলে প্রকাশ্যে বন্ধ করে দিয়ে গোপনে (মানে প্রকাশ্য হিসাবের বাইরে) তা' থেকে কয়লা তুলে চোরাই মালগাড়িতে কানপুরে চালান হচ্ছিল, সে-দিকটার বিপজ্জনকতার বিরুদ্ধে রায় দিলে আপনি—কোন

শক্তিই সমীরকে কাবু করতে পারতো না। আকারে-ইঙ্গিতে নানা ভাবে মালিক হয়ে-ও সমীর দত্ত আপনাকে অনেক খোসামোদ করেও টলাতে পারলে না আপনার মত থেকে। তখন, মানে অনেক দেরীতে, সন্দেহ জাগলো ওর মনে। হয়ত জানেন যে মুংরা এ সন্দেহ-সৃষ্টির ব্যাপারে অনেক সহায়তা করেছিল। মদ খেয়ে দিনরাত পড়ে থাকলেও মুংরার সহজ বৃত্তি তা'কে বলে দিচ্ছিল যে খনির পূব দিক থেকে গ্যাস উঠ্‌ছে কল্পনায়; চোরাই কয়লা উঠ্‌ছে বাস্তবে। গ্যাসের বদলে একটা গোপন ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছিল সে। অথচ মালিক বেঁচে থাকতে মুংরাকে আঘাত করা অসম্ভব। উত্তেজিত সমীর যখন গ্যাসের ভয় অতিক্রম করে নিজেই খনিতে নামতে চাইল, তখন বিধাতার চক্রে আপনিও সেখানে উপস্থিত হলেন এবং সুযোগ নিলেন পুরোমাত্রায় তা'র অবিবেচনার সাক্ষী মানবার। কঠোর নিয়মানুবর্তী ও গোঁয়ার মানুষ সমীর—তা'র চরিত্র আপনি জানতেন, ডাক্তার সিংহ! রীতিমত অঙ্ক করে' পূর্বাহ্ণেই আপনার অভিনব অস্ত্রটি খাতের অন্ধকার কোণে রেখে এলেন। তারপরে যা' ঘটল তদন্তের বিবরণে তা'র কোন অভাব নেই। কিন্তু সমীর দত্ত মারা গেল এবং সঙ্গেকার কুলীগুলোও। ম্যানেজার খাতের মুখ অব্‌ধি ওদের সঙ্গে বাধ্য হয়ে গিয়েছিল; ভিতরে ঢোকে নি। বোমা ফাটবে, সে জানতো। সময়মত ছুট দিলে সে এবং বাঁচালে নিজকে। কিন্তু যা'রা সে-সন্ধ্যায় নেমেছিল তা'দের সবাই মরল কি? একটি লোক বেঁচে থাকল এবং

সে হল মুংরা—সমস্ত কুলীর সর্দার। ম্যানেজার তাকে গলির মধ্যে মারবার চেষ্টাও করেছিল। কিন্তু সে চৈতন্য হারালেও জীবন হারাল না। কঠিন, যোয়ান লোকটা ধীরে ধীরে বেঁচে উঠল আপনারই হাসপাতালে। এই ব্যাপারের আগাগোড়া জিনিষটার মধ্যে এতকাল শুধু মুংরার এই বেঁচে বা সেরে উঠবার রহস্যটাই আমি ধরতে পারছিলাম না। কিন্তু এখন বুঝতে পেরেছি নিঃসংশয়ে! মুংরা যে মুহূর্তে অজ্ঞান অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়ে তা'র জীবন মৃত্যু সব সমর্পণ করে দিল নিজের অজ্ঞাতে আপনার হাতে, সেই মুহূর্ত থেকে মুংরার সম্পর্কে আপনি হলেন পূরোপূরি ডাক্তার। ষড়যন্ত্রকারীর লেশমাত্র রইল না আপনার ব্যক্তিত্বে। তা' ছাড়া মুংরা আপনার নয়া অস্ত্রের আঘাত খেয়েছিল। বিষাক্ত বাষ্পও ঢুকেছিল বুকের মধ্যে। সযত্ন চিকিৎসায় তা'কে ভালো করবার মধ্যে আপনার গবেষণার একটা মস্ত দিক লুকিয়ে ছিল বোধ হয়! ···হ্যাঁ, নিশ্চয়। শিশিটার দিকে অমন করে চাইছেন আপনি। এই চাউনির অর্থ আর যা'র কাছেই হোক্—আপনি আমার কাছে ছাপ্‌তে পারবেন না। শিশির ওষুধটার পরীক্ষা হাসপাতালের সহস্র রোগীর উপর আপনি করতে পারছেন ; সুযোগের অভাব ঘটবার কোন কারণই ছিল না। কিন্তু মুংরার মত এমন অসহায়ভাবে কেউ তো হাতে এসে পড়ে নি আপনার! মুংরার মত তো কারুর বুকের ভিতরটা পুড়ে যায় নি আপনার অভিনব সৃষ্টির বাষ্পে। তাকে ভাল করে, সম্পূর্ণ সুস্থ

করে তুলবার মধ্যে তাই কোন সময়েই আপনার ধর্ম থেকে বিচ্যুতি ঘটে নি। কিন্তু সে যখন ভাল হয়ে উঠল, তখন আপনি বুঝতে পারলেন যে, সেই অদ্ভুত পরিস্থিতির ব্যাপারে মুংরাকে বাঁচানো আপনার হয়েছে প্রকাণ্ড একটা ভুল। টাকা দিয়ে ওর মত লোকের মুখ বন্ধ করা সম্ভব ছিল না। কারণ টাকা পেলেই করবে বে-পরিমাণে নেশা আর মদের ফেনার সঙ্গে বেফাঁস কথা বেরিয়ে পড়বার ফলে বিপদ ফণা তুলবে আপনার শিয়রে কালো কেউটের মত। কানপুরে বসে লালা শ্যামরতন পর্যন্ত ঘেমে উঠল। অনেক আলোচনার পরে মিলের ৩১ নম্বর জাল চাক্‌তিটা এলো ভদ্রপুরে—বর্ত্তমান মুহূর্তে ধানবাদে আটক সাঁওতালটার ট্যাঁকে আত্মগোপন করে। মুংরাকে আপনারা বুঝিয়ে দিলেন যে মুখ খুল্‌লেই সে নির্ঘাত মারা পড়বে। যদিও সম্পূর্ণ নির্দোষ—তবু প্রমাণ যা'বে তা'র বিপক্ষে। যেখানে সবাই মারা গেল বা হল নিমখুন, সেখান থেকে অমন অক্ষতভাবে বেরিয়ে এল সে কি করে? কে বিশ্বাস করবে তা'র কথা! একদিন তাকে নিয়ে গিয়ে নয়া সাঁওতালটার চাক্‌তি দেখিয়ে বলা হল যে, দরকার হলে খনির ম্যানেজার সেটাকেই বলবে মূল বা আসল ৩১ নম্বর বলে। ভয় পেল সে। তার অল্প পরেই কৌশলে ওর কাছ থেকে চাক্‌তিটা নিয়ে ভবিষ্যতের সম্ভাবিত বিপদ ঠেকাবার জন্য দুর্ঘটনার স্থলে ফেলে রাখা হল—খাতের অন্ধকার এক কোণে। মুংরার উপরে আপনাদের কথা কাজ করল চমৎকার। সে এতটা ভয় পেয়ে

গেল যে আপনাদের চেয়ে-ও বেশী উৎসাহী হয়ে উঠল, কুলী মহলে সমীর দত্ত বা তার এত পেয়ারের মালিকের শোচনীয় এবং সন্দেহজনক মৃত্যুর সব রকম আলোচনার টুঁটি টিপে মারবার জন্য। ওদিকে আমদানী-করা সাঁওতালকেও আপনারা রাখলেন শূলে চড়িয়ে। তা'কে দেখানো হল যে মুংরাই তা'র সবচেয়ে শত্রু। কেননা সেও পরেছে তার নম্বর—মানে ৩১ নম্বর এবং তার জোরে সর্দারী করছে খনির কুলীদের উপর। লালা শ্যামরতন বা ম্যানেজারের বিরুদ্ধে সে নালিস করলে কেউ বিশ্বাস করবে না। পুলিস তাদের ভয় করে, মেনে চলে। কিন্তু তা'কে তা'রা যে-কোন সময় ফাঁসিয়ে দিতে পারে; বিশেষতঃ তা'র নম্বরই যখন চুরি গিয়েছে। আরো বললেন যে মুংরাকে মারতে না পারুক, ৩১ নম্বরটা ফিরে পাওয়া তা'র প্রাণ বাঁচানোর জন্য একান্তভাবে আবশ্যক। নিজেরটা খুঁজে না পাক, মুংরার নম্বরটা সরাতে পারলে তার বিপদ কেটে যাবে কমের পক্ষে পনের আনা। এ-ছাড়া মুংরা যাতে তার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করতে না-পারে অথবা বাইরের কোন অপরিচিত লোকজন সর্দারের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে তার (সাঁওতালের) বিরুদ্ধে কোন কথা না-জানতে পারে, সেটা তদন্তের কালে এবং তদন্ত শেষ হয়ে গেল আরো প্রায় মাস ছয়েক বিশেষভাবে দেখা দরকার। অদ্ভুত কৃতিত্ব আপনাদের। মুংরা ঠেঙ্গানোর ভয় দেখাতে লাগলো চরম নেশার ঘোরে-ও, আর মুংরার উপর নজর রাখতে লাগল সেই

সাঁওতালটা। সবই বোধ হয় চাপা পড়ে গেল। মুংরার নাম-ও উচ্চারিত হতে পারল না তদন্ত কমিটির কাছে। অদ্ভুত জবানবন্দী হল আপনার। এমন অদ্ভুত যে তদন্ত কমিটির রিপোর্টের কমপক্ষে সিকি ভরেছে আপনার অকুণ্ঠিত, উচ্ছ্বসিত প্রশংসায়।

থামল ক্ষণেকের জন্য সতীশ। ডাক্তার উত্তেজিত ভাবে নড়ে উঠেছিল—বোধ হয় সেদিকে দৃষ্টি পড়তেই কথা বন্ধ হল সতীশের।

ডাক্তার বলল, প্রশংসা করেছে! কিন্তু তবু আমি হেরে গিয়েছি! আমি জানি না সাঁওতালটা কোন স্বীকারোক্তি করেছে কিনা অথবা করে থাকলেও সত্যিসত্যি কি বলেছে। কিন্তু কি করে যে খাতের ৩১ নম্বর চাকতিটা আপনার হাতে পৌঁছল, সেটা কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। তার চেয়েও বিস্ময়কর—সাঁওতালটাকে কি করে হাত করলেন!

—তা'তেই কি গোলমাল হয়ে গেল আপনাদের? ··· যদি তা'ই হয়ে থাকে তবে আজকার এই পরাজয় ঘটিয়েছে আপনাদের আর একটি ছোট্ট ছেলে: বাসুদেব তার নাম! সতীশ যেন ষ্টেসনের সেই মূর্তি পরিষ্কার দেখতে পেল।

ডাক্তার চুপ করে থেকে—অনেকক্ষণ পরে মন্তব্য করল, তা'রও আগে পরাজয় ঘটেছে আমার।

—কি করে?

—আমি ভাবতে পারি নি যে সমীর দত্তের মৃত্যু নিয়ে কোনই সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে। এমন স্বাভাবিক এবং পরিষ্কার খুন দেখেছেন আপনি কোথাও ? তবু কি করে সন্দেহ করতে পেলেন আপনারা! আমি জানতাম, বহুবার বলেছি ব্যানার্জিকে যে আমাদের নিরাপত্তা নির্ভর করছে কোন রকম সন্দেহ সৃষ্টি না-হওয়ার মধ্যে। একবার সন্দেহের অবকাশ ঘটলে অপরাধ প্রমাণ না হলেও দশের চোখে আমাদের অপরাধী বলে গণ্য হতে হবেই !

মনে মনে ডাক্তারের প্রশংসা করল সতীশ আরো একবার ! এত অল্প কথায় এতবড় ব্যাপারটার মূলে পৌঁছান একমাত্র ডাক্তার সিংহের মত সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের পক্ষেই সম্ভব।

সতীশ বলল, শুধু একটি ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল আমার। সাত্যকি চাটুয্যে যে দিন ম্যানেজারের সুপারিশ নিয়ে খনি কিনবার প্রার্থী হল, সেদিনই মনের ভিতর একটা কাঁটা যেন খচ্ করে ফুটল। ডাক্তার হেসে মন্তব্য করল, বৈজ্ঞানিকে আর ব্যবসায়ীতে মোটা তফাৎ এখানে। আমার লোভ ছিল না এক ফোঁটা। কিন্তু বাড়ুয্যে বাকসংযম করতে সক্ষম হলেও বড় কুঠিতে বাস করবার লোভটা দু'এক বছরের জন্যও সম্বরণ করতে পারলো না। অথচ অবাক হচ্ছি জেনে সাত্যকির কথা! একটিবারও একথাটা কিন্তু আলোচনা করে নি ম্যানেজার আমার সঙ্গে !

সতীশ বলল, এই সন্দেহের সূতো অবলম্বন করে পৌঁছলাম ভদ্রপুরে। এসে দেখলাম যে দুর্ঘটনার ফলে তুচ্ছ একটা কুলী মরলেও যতটুকু আলোড়ন-আন্দোলন চলে, সমীর দত্তর মত একটা ডাকসাইটে লোক মরবার পরে ততটুকু আলোচনা-ও তা নিয়ে হচ্ছে না! বুঝলাম যে কঠিন হস্তে কেউ অদৃশ্যভাবে সব আলোচনার শ্বাসরোধ করে রাখছে। কাজেই এই মৃত্যুর মধ্যে রহস্য আছে নিশ্চয়। স্বাভাবিক মৃত্যু হয় নি সমীর দত্তর। এর পরেই আপনার গাড়ি চাপা দিতে চেষ্টা করল আমাকে। ঘটনার এই অংশে আপনার প্রশংসা এবং নিন্দা—দুই-ই করতে হবে। পথ ছেড়ে একটা শুকনো গর্তের দিকে সরে গেলাম আমি। গাড়ি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত ছিল আপনার। তাতে আমার মৃত্যু ছিল নিশ্চিত। আর আপনি, খুব বেশী হলে, আহত হতেন অল্প বিস্তর; মরতেন না কিছুতেই। পক্ষান্তরে আহত হলে আপনার জন্যই মানুষ দুঃখিত হ'ত খুব এবং প্রাণপণে বাঁচাতে চেষ্টা করেছেন অপরিচিত বিদেশী লোকটাকে এ-কথাও অনেকেই বিশ্বাস করত। এই সুযোগ নেন নি বলে নিন্দা করবো। কিন্তু আপনি সহজে আমাকে বুঝে নিতে পেরেছিলেন এবং গাড়িটাকে অপূর্ব নৈপুণ্যে গর্তটার প্রায় মাঝখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন তা' যখনই স্মরণ করবো, তখনই করবো প্রশংসা।

ডাক্তার সিংহ অত্যন্ত সহজ গলায় উত্তর দিল, একেবারে সাক্ষাৎ ভাবে একটা লোক মারতে আমি চাই নি। হয়ত সে-

ক্ষমতা বা প্রবৃত্তি আমার নেই। পরে অবশ্যি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে খুঁজেছি আপনাকে, কিন্তু পাই নি। ভদ্রপুরে থাকলে আপনাতে আমাতে এভাবে কখনো দেখা হত না।

সতীশের গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

একটু বাদে সতীশ বলল, এ-বাড়িতে কি লোক থাকে না আর?

—কেন?

খানিক দূরে রাতের অন্ধকার কেঁপে উঠল পর-পর দুটো গুলীর আওয়াজে। উত্তর দিতে হল না। আর নিকট থেকে ওদের কানে এলো বহু আগন্তুকের পদশব্দ। অনেকগুলি ভারী বুট্ জুতো বাংলোর সড়কের সুরকি ও পোড়া কয়লার খোয়া ভেঙ্গে এগিয়ে আসছে। শব্দটা কালো রাতের অন্ধকারে রুদ্ধ আক্রোশের মত মনে হল। সতীশ বুঝল যে পুলিসে ঘেরাও করেছে বাড়িটা। কয়েকজন গেট্ খুলে ঢুকছে ভিতরে; পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে আলোকিত এই ঘরটার দিকে। বারান্দায় উঠেছে এসে—হাত-রাইফেলের উপর খোলা সঙ্গীন চড়িয়ে; মুখে ফুটে উঠেছে হিংস্রতা।

সতীশও হাসল একটু। কতই-না সোজা এদেশীদের বিপর্যস্ত করা? মনে হচ্ছিল যে-ভাবে ওরা বারান্দায় উঠে এগিয়ে আসছে তাতে একাকী অন্ধকার দেওয়ালের আড়ালে থেকে সতীশ ইচ্ছে করলে অনায়াসে দশ-পনরটাকে শুইয়ে দিয়ে পালিয়ে যেতে পারত! দুর্বলের উপর নৃশংসতা করতেই

যারা শিখেছে, তাদের কাছ থেকে আশা করা-ও আহম্মুকী। চেয়ে দেখল, ডাক্তার সিংহ চোখ বুজে হাসছে। এতটুকু বিকার নেই, নেই সামান্যতম বিড়ম্বিত বা ভীত হওয়ার আভাস।

সতীশ জিজ্ঞাসা করল, হাসছেন যে ?

চট করে উত্তর এল, এই ভেবে যে আজ আমার অদ্ভুত অস্ত্রটার একটা মস্ত পরীক্ষা হয়ে যেতে পারতো যদি-না মূর্তিমান বাধার মত আপনি উদ্যত থাকতেন এখানে। আমার মনে হয় যে একটার বেশী দরকার হত না!

লোকগুলি ঘরটাকে চারদিক থেকে ঘিরেছে কিন্তু এখনো কেউ জানলা বা দরজার ধারে আসছে না।

কঠিন গলায় সতীশ জানতে চাইল, বাইরে কে ?

—সশস্ত্র পুলিস !

—ভেতরে আসুন ! দু'জনের বেশী নয়। আমি সতীশ। ভয় পাবার কোন কারণ নেই। দেখুন না, আমাকে এই দরজার আড়াল থেকে।

একজন ইনস্পেক্টার ওকে দেখেছিল আগে। সে দু'হাতে দু'টো রিভলভার ঝুলিয়ে এসে ঘরে ঢুকে বলল, আমরা ডাঃ সিংহকে গ্রেপ্তার করতে এসেছি।

সতীশ বলল, এখানেই রয়েছেন ডাক্তার। ভদ্রলোক আহত—খুব বেশী রকম চোট খেয়েছেন। আপনি ওঁকে গার্ড করুন ; দাঁড়ান এখানে। ডাক্তার সিংহ !

—বলুন ?

—আপনার শোবার ঘরের টেবিলের উপর বল্‌ছিলেন—না ? সে ঘরে জল আছে নিশ্চয়ই ?

ডাক্তার হেসে ঘাড় নাড়ল। সতীশ মিনিট খানেকের মধ্যেই ফিরে এল। জলের গ্লাসটা এগিয়ে দিয়ে বলল, খান। দেরী করতে হয়েছে অনেকটা···আমি এদের আরো অনেক আগে আশা করেছিলাম। এবারে দেখুন তো এ-কাগজটাই কিনা ? পড়ে যাবো ? তা'হলে শুনুন। খুব ধীরে-ধীরে সতীশ কাগজটা পড়তে স্বুরু করল। ডাক্তার সিংহ বললেন, এটাই। আপনার কাছে রেখে দিন্‌ ! একটা অলিখিত কিন্তু ভদ্রলোকের সর্ত আমাদের মধ্যে এই থাকবে যে মামলার পরে ফিরে আসা পর্যন্ত একটা কোন বড় ব্যাংকের নিকট সীল্‌ করে দেবেন। অবশ্যি আমি মরে গেলে, যেটুকু আমি এরই মধ্যে করেছি—তা'ই প্রকাশ করে দেবেন ডাক্তারী পত্রিকায়। কিন্তু ওরা কি পারবে ? —শুধু ব্যবসা, শুধু নাম, শুধু সম্পত্তি—এমন কি রাজনীতি করে আমাদের ডাক্তাররা। তা'দের কোথায় সময়, কোথায় বা প্রবৃত্তি !

আপন মনেই কথাগুলি বলে যেতে লাগল ডাক্তার। গলাটা একটু ধ রে এল কি ? ঠিক বুঝা গেল না। আর সেটা দৈহিক যন্ত্রণায় কি বর্তমান মুহূর্তের উদ্বেগে তা' কে ঠিক করে বলতে পারে ?

ইন্‌স্‌পেক্‌টারকে সতীশ ইঙ্গিত করল ডাক্তারের কাছ থেকে

একটু সরে দাঁড়াতে। লোকটা ওদের দুজনের এই রকম আলাপ ব্যবহারে যেমন হচ্ছিল বিস্মিত, তেমনি বিরক্ত। প্রশ্ন করল, খানা-তালাস করতে হবে না ?

—দরকার নেই। টেবিলের উপর থেকে খুব সাবধানে এই কয়েকটা বোতল এখানেই সীল্ করে নিন। আর সব চেয়ে দরকার আমাদের বোমার ফর্মুলাটা। সেটা আছে এই ব্লটিং প্যাডের ভিতরের এই অংশে।

অকস্মাৎ বজ্রপাত হল যেন ঘরে। ডাক্তার একটা প্রবল চেষ্টা করল বাধা দিতে, কিন্তু ইনস্পেক্টার ধরে ফেলল তাকে। সতীশ প্যাড্টা খুলে বাস্তবিকই পেল কাগজটা।

খুবই অল্প সময়ের মধ্যে নিজকে সংযত করে নিয়েছিল ডাঃ সিংহ। প্রায় সহজ গলাতেই ধীরে-ধীরে বলল, এবারে সত্যি আমার পরাজয়ের পালা সতীশবাবু! একটিমাত্র কাজের জন্য হলেও আপনাকে আমি আর ছোট বলে ভাবতে পারি নে। আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ অভিনন্দন জানবেন।

সতীশ বলল, আপনার মত বুদ্ধিমান লোক দেওয়াল খুঁড়ে বা আলমারীর চোর খোপে এটা রাখবে না—আমার এরকম সন্দেহ ছিল। কিন্তু এত প্রকাশ্যে, এমন সন্দেহ-হতে-পারেনা একটা জায়গায় থাকবে তাও অবশ্যি ভাবতে পারি নি। কিন্তু দু' দুবার আপনার চকিত দৃষ্টিই আমাকে বলে দিয়েছে এখানটায় ফর্মুলার গোপন অবস্থিতির কথাটা।

ডাক্তার সিংহ হাসল।

বাইরে একটা মোটর গাড়ির শব্দ শুনা গেল।

সতীশ দ্রুত জিজ্ঞাসা করল, ষ্টেসনের ওষুধের বাক্স-গুলি আটক করা হয়েছে ? —ভোরে করা হবে। লোক গেছে।

—এ কী করছেন! টিংচারের বোতলগুলি ওভাবে হাতে ঝুলিয়ে চলেছেন কোথায় ? এগুলি খুব নিরাপদ জিনিষ না-ও হতে পারে। খুব সাবধানে এখানেই বসে সীল্ করুন! ভিতরে কি আছে, আমি জানি নে। খুব বড় রাসায়নিক দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে। ম্যানেজারের জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়েছে ?

—ধানবাদের পার্টিই গেছে সেখানে।

—বাসু ? পার্টির সঙ্গেই গিয়েছে নিশ্চয়! বাসুদেবকে জানেন না ? বাইরে দ্রুত পদশব্দ হল।

—আমরা এই আস্‌ছি সতীশ দা' ! তুমি বেঁচে আছ ? ডাক্তার সিংহ ? বাইরে থেকে বাসুর কণ্ঠ এলো।

সতীশের মস্ত একটা দুর্ভাবনা কেটে গেল। উচ্ছল কণ্ঠে ওকে ডাকল। কিন্তু ভিতরে আসতেই সতীশের চোখ বড় হয়ে উঠল। মস্তবড় একটা ব্যাণ্ডেজ্ করা হয়েছে অপটু হাতে পরিষ্কার একটা তোয়ালে জড়িয়ে ঃ সেটাও ভিজে উঠেছে রক্তে !

বাসু বলল, বাইরে ম্যানেজারের গাড়িতেই আমরা এসেছি। এ-কী ! তোমার অবস্থাও তো ভালো নয়, সতীশ দা !

—কিন্তু কি করে হলো ?

—বিশেষ কিছু হয় নি। ম্যানেজারের গুলী কাঁধের খানিকটা মাংস কেটে পরিষ্কার বেরিয়ে গেছে। আমাকে দেখেই সে যেন ভয়ানক খুসী হয়ে উঠল। বলল, তোমাকেই খুঁজছিলাম, বিনয় ছুঁচোটাকে আমার কাজ নেই! সঙ্গে সঙ্গে দড়াম্ করে আওয়াজ হলো একখানা। পড়ে গেলাম। আরো একটা আওয়াজ শুনলাম গুলীর। দুপ্দাপ্ করে সঙ্গের লোকগুলি বারান্দা দিয়ে ছুটে পালাল। আমি যা ভয় পেয়েছিলাম, কি বলবো! হাতে কোন অস্ত্র নেই, লোকটা বেপরোয়া রকম গুলী করছে। বুঝলাম আর দেখা হল না। খানিক সময় গেল···যেন বুঝতে পারছিলাম না, আরো গুলী লেগেছে কিনা আমার গায়ে। বুঝতে পারছিলাম না আমি বাঁচবো কিনা। মিট্মিট্ করে চাইলাম—সে কী! বাড়ুয্যে-ও যে তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে আমার কাছেই! রক্ত আসছে গড়িয়ে চক্চকে সিমেণ্টের মেঝে বেয়ে! সংক্ষেপে বলতে গেলে ব্যাপারটা এই যে আমাকে গুলী করে সে বুঝেছিল যে আমি নিশ্চয়ই মরেছি। পরে আত্মহত্যা করেছে সে!

—লাস কোথায় ?

পুলিসের লরীতে তুলে দিয়েছি। তারা আলাদা রওনা হয়ে গিয়েছে। এ-বাড়ির চাকর বেয়ারাগুলি আমাদের পৌঁছবার আগেই বাড়ুয্যেকে খবর দিয়েছিল একটা কিছু। হাতিয়ার নিয়ে প্রস্তুত হয়ে ম্যানেজার গাড়িটা কেবল বার করেছে

বাগানের পথে—আমরা গিয়ে পৌঁছলাম। বাড়ুয্যে চোখের নিমেষে ঘরের ভিতর চলে গেল। কিন্তু দরজা বন্ধ করল না। তারপরের কথা মোটামুটি বলেছি। তোমাদের হয়ে থাকলে চলো, সতীশ দা! আমি আর দাঁড়াতে পারছি নে।

ডাক্তার সিংহকে বাইরে নিয়ে যাবার জন্য তারই একটা ষ্ট্রেচার এনে নামানো হয়েছিল ঘরে।

সতীশ বলল, ডাক্তার সিংহ! এরই নাম বাসু।

হেসে ডাক্তার সিংহ বলল, বাসুদেবকে আমি চিনি, সতীশবাবু!

—হ্যাঁ। এর জন্য আপনার ওষুধটা একটু চাই ডাক্তার, খুব রক্ত পড়ছে, দেখছেন তো!

ডাক্তার নিজেই এগিয়ে দিল গাঢ় নীল রংয়ের শিশিটা! মুখ আড়াল করে কেমন বিকৃত কণ্ঠে বলল, কোন ভয় নেই, সতীশবাবু! এক্ষুনি আপনার বাসু ঠিক হয়ে উঠবে। খুব বেশী দেবেন না। তোয়ালেটা খুলে ফেলুন।

বাসু বিস্মিত দৃষ্টিতে একবার ডাক্তার সিংহের দিকে চাইল। সতীশ ততক্ষণে ওষুধটা ঢেলে দিয়েছে।

সতীশ আবার বলল, কিছু মনে করবেন না ডাক্তার। এই ছেলেটা বাস্তবিক আপনার দান গ্রহণ করবার যোগ্য।

ডাক্তারের মুখে একবার পরিষ্কার ভাবাবেগের চিহ্ন ফুটে উঠল। কোন কথা বললো না। ওরা তখন আহত সিংহকে ষ্ট্রেচারে করে ঘরের বাইরে নিয়ে যাচ্ছিল। দরজার কাছে

যেতেই ধম্‌কে উঠল সতীশ, সাবধান যেন চৌকাঠে না লাগে। দেখ্‌বেন ইনস্‌পেক্‌টার সাহেব !

ইনস্‌পেক্‌টার বিস্মিত হয়ে চাইল।

সতীশ বাস্থুর দিকে চেয়ে বলল, কেমন ?

—আশ্চর্য। রক্তটা এরই মধ্যে থেমে গেল কি করে ? ব্যথাটাও পড়ে গিয়েছে অনেকখানি। কি ওষুধ এটা সতীশ দা !

—কথা বলিস নে, বাস্থু। চলে আয়। ওরা এগিয়ে গিয়েছে। ইনস্‌পেকটার লোকটা হয়তো কোন রকম অপমান করতে পারে ডাক্তারকে।

---

এ-বইয়ের সমস্ত ঘটনা এবং চরিত্র কাল্পনিক।